রামাদান আমার ভালোবাসা

- শাইখ আতীক উল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

পিডিএফের ভুলভ্রান্তির দায়ভারঃ **Mashwara Official**

কোন ভুল চোখে পড়লে ইমেইলে জানানঃ minhazulislam229@gmail.com

Mashwara Community

<<<...যুক্ত হোন আমাদের সাথে...>>>

রাব্বে কারীম ইখলাসের সহিত দ্বীনের খেদমত করে যাওয়ার তৌফিক দিন, আমিন

আমাদের পেইজে **ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি** ভাইয়ের দাওয়াহ কোর্সের রেজিষ্ট্রেশন এখনও চলমান। আজীবন এই কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম চলমান থাকবে...

আমাদের মূল কাজ যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে। ইতিমধ্যেই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের **"গুরুত্বপূর্ণ লাইভ আলোচনা"** প্লেলিস্টের ভিডিওগুলো (যা আমাদের বিভিন্ন সময়ে হওয়া ফেসবুক লাইভ আলোচনার সংগ্রহ) থেকে সদ্য দ্বীনে ফেরা অনেকেই ব্যাপক উপকৃত হয়েছে। রাব্বে কারীম কবুল করে নিন আমাদের ক্ষুদ্র কাজগুলোকে। খাস করে দুআর দরখাস্ত...

আমাদের সমস্ত কার্যক্রমঃ-

Facebook Page:— https://www.facebook.com/MashwaraOfficial

Facebook Group:—

https://www.facebook.com/groups/dawah.deeni.alocona/?ref=share_group_link

Youtube Channel:— https://youtube.com/c/UmarMinhaz

Telegram Channel:— https://t.me/mashwaraofficial

উক্ত পিডিএফের সূচিপত্র এক নজরেঃ-

মোট ৩৫টি লেখা এসেছে এখানে। শাইখের পোস্টে ২৪ নং পর্বের লেখা ২ বার থাকলেও আমরা শাইখের ৩৪ পর্বের লেখাকে মোট ৩৫ পর্বের আকারেই সাজিয়েছি।

ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ রিমাইন্ডার —

০১, ০৬, ০৯, ১৩, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো (এগুলো খুব মনোযোগের সহিত পড়া চাই, প্রত্যেকটি লেখা নিজেকে গড়তে ব্যাপক কার্যকরী হবে) —

০৩, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫

বিভিন্ন ঘটনা সিরিজ —

০৪+০৫ একটি ঘটনা। ০৭+০৮ একটি ঘটনা। ১২, ১৭, ১৮, ২১ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। ২২+২৩+২৪+২৫ একটি ঘটনা

০১

আগের তুলনায় রামাদানের গুরুত্ব বাড়ছে না কমছে? এমন একটা প্রশ্ন আসলো।

- উত্তরটা কী?

কথা হচ্ছিলো মুহাম্মাদের সাথে। সে বললো:

- আমার তো মনে হয়, গুরুত্ব বাড়ছে।

- কিভাবে বুঝলে? তুমি কি আগের রামাদান দেখেছো?

- না দেখিনি। তবে রামাদান আসার আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গায়, যেভাবে রামাদানকে সাদরে বরণ করার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়, তাতেই মনে হয়েছে। আগে বোধহয় এমন ছিলো না।

- তোমার কথা এক অর্থে ঠিক আছে। আরেক অর্থে ঠিক নেই।

০২

রামাদান বিষয়ক বিভিন্ন বইপত্র, কিতাবাদি সংগ্রহ করছি। সবগুলোতেই রামাদান নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা। ওয়াজ-নসীহত। ফযীলত-বরকত।

এ ধরনের বইপত্র পড়তে ভালো লাগে না। আগ্রহ খুঁজে পাই না। আমি চিন্তা করে দেখেছি, এটা আমার ভেতরের সমস্যা। বইপত্রের সমস্যা নয়। আবোল-তাবোল বইপত্র পড়ে পড়ে রুচিবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য সব বইতেই খালি মজা পেতে ইচ্ছা হয়।

রামাদানে কত কী যে হয়। প্রত্যেকটা বিষয়ই আলাদা আলাদা গুরুত্বের দাবি রাখে। চাঁদ দেখা থেকে শুরু হয়। এরপর আসে একে একে তারাবীহ পড়া। সেহেরি খাওয়া। ইফতার করা। এই তিনটা হলো মৌলিক কাজ। আলোচিত কাজ।

এরপর আসে, শেষ দশকে ই'তিকাফ। বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদরের অন্বেষণ। এরপর ঈদের চাঁদ। ঈদের আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায়।

রামাদানে আরেকটা বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব থাকে, সেটা হলো যাকাত। যদিও যাকাত আদায়ের সাথে রামাদানের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একে সত্তুর। এই লাভের আশায় সবাই রামাদানেই যাকাত আদায় করতে সচেষ্ট থাকে।

আসলে রজব থেকেই শুরু হয় রামাদানের তোড়জোড়। তখন থেকেই রামাদানের আবাহনি বার্তা চলে আসে। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে:

আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শা'বান। ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।

আমরা যারা মাদরাসায় পড়ি, তাদের জন্য তো রামাদান মানে মাসব্যাপী একটা ঈদ। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলেই ছুটি। এবার অবশ্য স্কুল-কলেজও ছুটি থাকবে। বেশ ভালো হয়েছে। সেই আগের মতো ছেলেপেলের কুরআন শিক্ষায় মনোযোগ দিতে পারবে। ধার্মিকরা চিল্লায় যেতে পারবে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

মুরুব্বিরা এ বিষয়ে ভাববেন বলে মনে হয়। মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে মিলিয়ে কোন কিছু করা যায় কিনা। এক সুতোয় গাঁথা যায় কিনা। তবে হাফিজদের জন্য রামাদান পাহাড়সম এক চাপ বিশেষ। অবশ্য সবার জন্য নয়। কারো জন্য অবশ্য

পৌষ মাসও বটে। আমার জন্য রামাদানটা কখনোই পৌষমাস ছিলো না। সেই নিয়মতান্ত্রিক তালিবে ইলমি যিন্দেগিতেও না, আর এখনো না।

০৩

সাত খণ্ডের একটা কিতাব আছে। সালাহুল উম্মাহ ফী উলুউভিল হিম্মাহ। কিতাবটা আমাদের পটিয়া কুতুবখানায় ছিলো। প্রথম বার যখন কিতাবটা হাতে পাই, যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। তখনো আরবি ভাষাটা অত সড়গড় হয়নি। তারপরও আরবি কিতাবাদি তাক থেকে নামিয়ে পড়ার ভান করতাম। আশেপাশের অন্যরা চোখ বড়বড় করে তাকাতো। সেটা আড়চোখে দেখে বেশ ভাবের সৃষ্টি হতো। থানুভি রহ. বলেছেন রিয়া সে আদত। লোকদেখানো অভ্যাস থেকেই আমলের অভ্যেস তৈরি হয়।

কিতাবটা খুবই চমৎকার। আমার তখন পর্যন্ত এত সুন্দর কিতাব হাতে পড়েনি। এখন যেমন সবাই লা-তাহযান কিতাবটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে, আমিও সেই সময়েই সাত খণ্ডের বিশাল কিতাবটা সংগ্রহ করার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু স্বপ্নটা আজো বাস্তবায়িত হয় নি। তা না হোক। তবে স্বপ্নটা সেলুলয়েডে বাস্তবায়িত হয়েছে। মানে কিতাবটার একটা পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করতে পেরেছি।

কিতাবটা সাজানো হয়েছে বিষয়ভিত্তিক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে, মনীষীগণ ত্যাগ-তিতিক্ষার যে পরম পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তার বিন্যস্ত উপস্থাপনা দেয়া আছে। কিতাবটাতে রামাদান সম্পর্কেও চমৎকার আলোচনা আছে। চৌদ্দশত বছরে উলামা-ফুযালা ও বুযুর্গগণ কারা কিভাবে রামাদান কাটিয়েছেন। কত কষ্ট করে রোজা

রেখেছেন, কী অমানুষিক প্ররিশ্রম করে রাত জেগে ইবাদত করেছেন, তারাবীহ পড়েছেন এসব বিষয় বড় সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে।

রামাদান মাসটা আসলেই রহমতের মাস। এটা কিভাবে যেনো বোঝা যায়। অনুভব করা যায়। টের পাওয়া যায়। উপলব্ধি করা যায়। অনুভব করা যায়।

আমি প্রতিবারেই নিয়্যাত করি:

এবার রামাদানে একটা গুনাহও করবো না। রাস্তায় বের হলে হারামের দিকে তাকাবো না। কারো গীবত করবো না। কোনো রকমের পাপচিন্তা করবো না। পুরো বছরে অনেকের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি, এমনটা আর করবো না। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই কী থেকে কী হয়ে যায়, কোনো প্রতিজ্ঞাই টিকে থাকে না। তারপরো আশায় বুক বাঁধি।

প্রতি রামাদানের আগে নিয়্যাত করি:

এবার রামাদানে সুন্নাত তো বটেই, সামান্য থেকে সামান্য মুস্তাহাবও ফরযের গুরুত্ব দিয়ে আদায় করবো। সারাটা দিন কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই কাটিয়ে দেবো। কোনো বাংলা বই পড়বো না। গল্পের বই ছুঁয়েও দেখবো। মাসুদ রানা তো নয়ই। পত্রিকা তো বিষবৎ। পুরোপুরি দুনিয়ার বাইরে চলে যাবো। আযানের সাথে সাথে মসজিদে চলে যাবো। মাগরিবের আগে হালকা কিছু খেয়ে মসজিদে গিয়ে দু'আয় বসে যাবো। সারারাত জেগে লিখবো, পড়বো। এমনি আরো অসংখ্য প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু রামাদানে তৃতীয় দিন থেকে এসব আর মনে থাকে না।

কী যে করি! এবারও ভয়ে ভয়ে আছি। এবারও যদি ব্যর্থ হই? শয়তানের পাল্লায় পড়ি? রামাদানের অসম্মান করি? খেলা না দেখলেও যদি খেলার খবরের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ি?

ইয়া আল্লাহ! আমাকে বাঁচান। আমীন

০৪

মাহে রামাদান আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বাংলাদেশের মধুমাস। এই দুই মাসে বাংলার প্রায় সস ফলমূল পাকে। রসে টইটুম্বুর হয়। রসনা রঙিন হয়। যদিও এখন ফরমালিনের দৌরাত্ম্যে এসব ফলের রস বিষে পরিণত হয়েছে।

রামাদান হলো বিশ্ব-মুসলিমের মধুমাস। এই মাসে বিভিন্ন 'আমল' পেকে টসটসে হয়। আমলগুলো অন্য মাসের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি রসালো আর মাজাদার হয়। ফেব্রুয়ারি মাস ভালোবাসার মাস। ভালোবাসা দিবসের মাস। প্রেমের মাস। ভেলেন্টাইনস ডে-র মাস। প্রেমপিয়াসিদের বসন্তমাস।

রামাদান হলো আল্লাহপ্রেমিকগণের ভালোবাসার মাস। ভালোবাসা দেয়ার মাস। ভালোবাসা নেয়ার মাস। আল্লাহকে বেশি বেশি 'আই লাভ ইউ' বলার মাস। কুরআনকে 'আই লাইক ইউ' বলার মাস। শয়তানকে 'আই হেইট ইউ' বলার মাস।

মাহে রামাদান কোঁচড় ভরে সওয়াব তুলে নেয়ার মাস। আঁজলা ভরে রহমত খাওয়ার মাস। মুখ ডুবিয়ে করুণাবারি পান করার মাস। শুধু কি মুসলমানদের মধুমাস?

না, রামাদান অমুসলিমদেরও মধুমাস। অন্যধর্মাবলম্বীদেরও মধুমাস। কিভাবে? এবার একটা গল্প হয়ে যাকঃ

আমাদের সাহিত্য আড্ডায় একজন বড়ুয়া ছেলে আর মেয়েকে দেখতাম। বড়ুয়া মানে হলো তারা জাতে বাঙালি, ধর্মে বৌদ্ধ। তারা দুজনে মনে হয় ভাইবোন। পিঠেপিঠি। একজন আরেকজনকে তুই-তোকারি করেই বলতো। বোনটাই মনে হয় বড়।

দুজনের আচরণই বড় আপন আপন। কেমন মায়াকাড়া। একবার রোজা মুখেই সাহিত্য আড্ডার তারিখ পড়লো। আমরা মুসলমান সদস্যরা আগের সপ্তাহেই ইফতারির জন্য চাঁদা তুললাম। আমরা টাকা গুনছি, এমন সময় দুভাইবোন দ্বিধাজড়িত পায়ে গুটিগুটি এগিয়ে এলো। মেয়েটি যেনো লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাচ্ছিলো। এক জন আরেক জনকে ধাক্কাচ্ছে। এ বলছে তুই বল, ও বলছে তুই বল। আমাদের একজন বিষয়টা লক্ষ করলো।

- কী সুকুমার?

- ইয়ে মানে বলছিলাম কি, আমি আর অনিতা মানে আমার বোন চাইলে কি আগামি সপ্তাহের ইফতারে অংশগ্রহণ করতে পারবো?

- অবশ্যই পারবে। কেনো পারবে না?

- অনিতা বললো, তাহলে আমাদের দুজনকে কতো দিতে হবে?

- কিছুই দিতে হবে না। তোমরা আমাদের মেহমান।

এরপর দুই ভাইবোনে অনেক জোরাজুরি করলো, টাকা দেয়ার জন্য। আমরা কিছুতেই রাজি হলাম না। আমাদের জন্য এটা ছিলো অপ্রত্যাশিত। ঘটনার এখানেই শেষ নয়।

০৫

পরের সপ্তাহে আমাদের সাহিত্য আড্ডা শেষে ইফতার করতে বসেছি। ওদের দুজনকেও ইফতার দেয়া হয়েছে। দুজনের মুখে আনন্দের আভা। কী আগ্রহের সাথে তারা ইফতার করছে। পরে তারা দুজন বলেছে, তারাও নাকি সারাদিন কিছুই খায়নি। উপোস দিয়েছে।

- কেনো?

- আমরা আসলে পরীক্ষা করতে চেয়েছি, সারাদিন না খেয়ে থাকলে কেমন লাগে।

- কিন্তু আমরা তো ভোর রাতে সেহেরি খেয়েছি? তোমরা কিছু খেয়েছো?

- আমি সকালে নাস্তা করেছি। কিন্তু অনিতা সকালেও কিছু খায়নি।

- আচ্ছা, তোমরা কেনো এটা করলে? মানে ইফতার করলে, আবার আমাদের মতো রোজাও রাখার চেষ্টা করলে?

- আসলে ইফতার করতে ভালো লাগে।

- তোমরা কি আরো ইফতার করেছো?

- জ্বি।

- কোথায়?

- আমাদের ক্লাসমেট আমজাদদের বাসায়। আমরা একই পাড়ায় থাকি। সে-ই আমাদেরকে একবার দাওয়াত দিয়েছিলো।

সেদিন আমজাদদের বাসায় ইফতার করে যে মজা লেগেছিলো, এমন মজা আর কখনো কোনো খাবারে পাইনি। আম্মু পরে সেদিনের ইফতারের সেই খাবারগুলোই, পরে একদিন তৈরি করেছিলেন, আমরা প্রবল আগ্রহে খেতেও বসেছিলাম। কিন্তু কোনো স্বাদ পাইনি।

রামাদানকে অন্য ধর্মবলম্বীরাও সম্মান আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমার কাছে কখনো কখনো মনে হয়েছে, ভিন্ন প্রাণীরাও রামাদানকে ভিন্ন চোখে দেখে। একবার রামাদানে আমরা কামরায় বসে আছি। একটা কুকুর এলো। অনেক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করলো। আমরা ছেই ছেই করে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কুকুরটা গেলো না।

কামরায় ভোর রাতের উচ্ছিষ্ট ছিলো। হাড়গোড় ছিলো। সেগুলো ছুঁড়ে দিলাম। কুকুরটা খেলো না। মুখে করে নিয়ে গেলো। একটু দূরে হাসনেহেনা ফুলের ঝোপের আড়ালে গিয়ে খেয়ে আবার আসলো। বিষয়টা আমাদের চোখ এড়ালো না। পরীক্ষা করার জন্য আবার খাবার দিলাম। এবারো আগের মতো ঝোপের আড়ারে গিয়ে খেয়ে আসলো।

দারূণ তো!

০৬

ক্লাস থ্রি। তখন কতইবা বয়েস। রোজা রাখার ভান করেই স্কুলের মাঠে খেলতে যেতাম। কতক্ষণ পরপরই থুথু ফেলতাম। চাকমা আর হিন্দু সাথীরা চোখ বড় বড় করে তাকাতো।

- রোজা রাখলে মুখে থুথু আসে। সেই থুথু গেলা যায় না। ফেলে দিতে হয়। এ ধরনের কথা ওদেরকে আগেই বলে রেখেছি।

ওরা চোখ বড় বড় করে তাকায়। ওরে বাপস! রোজা রাখা কিযে কষ্টের! তারা বেশ সমীহ নিয়েই কথা বলে। রোজা রেখেছে বলে কথা! আমি তো রোজা না রেখেও সেকি ভান! ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরপরই কাতর ধ্বনি বের হচ্ছে। আহ্ কখন যে ইফতারির সময় হবে। আজ রোজাটা বেশ ধরেছে।

যতই ভান করি ওরা ততই চোখ বড় বড় করে তাকায়। আমি যেনো রাজা, আমি যে রোজা রেখেছি। রোজা না ছাই, আমি তো ঘর থেকে বের হবার আগেই এক তাগারি মেরে এসেছি। আবার ফিরে গিয়েও.....

আমি মিশ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস হয় এমন এক জনপদের মানুষ। বেশিরভাগ মানুষই অমুসলিম। তারা তো রোজা রাখবে না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে খাওয়া দাওয়াও করবে না এটা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তাই ঘটতো। উপজাতিরাও আমাদের রোজাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। এখন অবশ্য আগের সেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নেই। হানাহানি আর হিংসার জনপদে পরিণত হয়েছে। হুমায়ুন আজাদের ভাষায় ‘হিংসার ঝর্ণাধারা’।

রামাদানের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হলো চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখতে কখনোই আনন্দ অনুভব করিনি। যখন থেকেই হিফযের খতম শেষ হয়েছে তখন থেকে। চাঁদ উঠেছে শুনলেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠতো। ইশ! একটা মাসের জন্য বন্দী হয়ে গেলাম। সারাক্ষণ তারবীহের টেনশন। একটুও স্বস্তিতে থাকতে পারি না। তারাবীতে আটকানো যাবে না। লোকমা খাওয়া যাবে না। আবার পড়াতেও হবে সুন্দর করে।

পেছনে মুসল্লী হলো আর্মি-বিডিআরের সিও থেকে শুরু করে জোন কমান্ডার পর্যন্ত। এমন সব জাঁদরেল লোকের সামনে সামরিক কায়দায় নামাযের ইমামতি করা যে সে ব্যাপার নয়। অন্তত আমার মতো চুনোপুঁটি হাফিযের পক্ষে।

০৭

রামাদান হলো দাঁড়ির মৌসুম। পাঞ্জাবি-টুপির মৌসুম। নামাযের মৌসুম। ওড়নার মৌসুম। বিষয়গুলো ব্যাখ্যার দাবি রাখে। রামাদান আসলে অনেকেই দাঁড়ি রাখে। সে হিসেবে রামাদানের চাঁদ সিয়ামের চাঁদের পাশাপাশি দাঁড়ির চাঁদও বটে। চাঁদ দেখে কিছু মানুষ দাঁড়ি কাটা বন্ধ রাখে। আবার ঈদের চাঁদও দাড়ির চাঁদ।

ঈদের চাঁদ দেখেই অনেকে দাড়ি কেটে ফেলে। ঈদের দিন সকালে উঠেই হাঁকডাক করে রেজার ব্লেড শেভিং ক্রীম নিয়ে বসে।

আরেক শ্রেণীর দাঁড়িকাটা দল আছে। তারা হলো হাফিয শ্রেণী। এদের কেউ হিফযখানায় পড়ার পর অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথবা পড়াশোনা নিয়েই আছে, কিন্তু সেটা ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানে। যেখানে দাড়িকাটা স্বাভাবিক। দাড়ি না রাখাটাই স্বাভাবিক। ফ্যাশান। আধুনিকতা।

আমাদের সাথে একজন পড়তো। ধরা যাক নাম তার আদিল। খতম শেষ করে ভিন্নধর্মী এক প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। সারা বছর হুযুরের সাথে দেখা নেই। মাদরাসায় আসা-যাওয়া নেই। নামায-কালামেরও খুব একটা ধার ধারতে দেখিনি। দাড়ি ঈদের দিন থেকেই সাফফান সাফফা। পুরোপুরি না হলেও দক্ষ মালির বাগানের কাটাছাঁটা গাছের মতো তো বটেই। ঠুণ্ডা। আধখেঁচড়া। ক্ষয়াটে। আধখাওয়া।

আমাদের সাথে দেখা হতো মাদরাসার বাইরে। হাটে-বাজারে। খেলার মাঠে। সভা-সিমিতিতে। অনুষ্ঠান-আয়োজনে। সে নির্বিকারচিত্তেই ঘোরাফেরা করতো। দাড়ি নেই বলে কোনও বিকার নেই। নির্বিকার।

- কিরে দাড়ি কই?

- ইন্দুরে খাইছে।

এই ছিলো তার জবাব। পরিহাস নয়। সিরিয়াস। এভাবে পুরো বছর কেটে যায়। রজব মাস আসলে তার হালকা আনাগোনা মাদারাসার আশেপাশে দেখা যেতো। হুযুর ওকে দেখেই বলে ফেলতেন। এখন বোধহয় রজব মাস, তাই না রে?

- জ্বি। হুযুর।

- তাহলে রামাদানেরওতো বিশেষ দেরি নেই।

রামাদান আসছে এজন্য আমাদেরকে চাঁদ দেখতে হতো না। আদিলের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনেই টের পেয়ে যেতাম সেটা। যতই রামাদান ঘনিয়ে আসতো, আদিল ততই মাদরাসার কাছে ঘনাতো। মাদরাসার মসজিদে নামায পড়ার পরিমাণ বাড়তো।

প্রথমে জোহর বা আসর দিয়ে শুরু করতো। এরপর আস্তে আস্তে নামাযের পরিমাণ বাড়তো। ফজরের জামাতে শরীক হতো একেবারে শবে বরাতের আগখান দিয়ে।

০৮

রজব মাস শেষ। শা'বান শুরু। আমরা ওর দাড়ির মাফ থেকেই আরবি তারিখ মেলাতাম।

- কি রে কত ইঞ্চি হলো রে দাড়ি?

- মেপে দেখ না।

- তুই বল, আরবি তারিখটা জানা বড় জরুরি হয়ে পড়েছে যে!

- ফাযলামো করিস না। পত্রিকা দেখে নিলেই তো হলো।

- তুই বলছিস কি, পত্রিকাতেও তারিখ ভুল হতে পারে। কিন্তু তোর দাঁড়ির মাপে তো কস্মিনকালেও ভুল হতে পারে না।

- দেবো এক থাপ্পর। যা ভাগ। আচ্ছা, হুযুর মাদরাসায় আছেন? বাড়ি যাবেন কবে?

এই প্রশ্ন থেকে বুঝতাম। শা'বানের পাঁচ তারিখ পার হয়েছে। দশের আগে কোনও একটা তারিখ হবে। এরপর হঠাৎ একদিন দুপুরের বারটার আগে। হুযুর তখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। আমরা উঠে গেছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি আদিল একমনে হযুরের পা দাবাচ্ছে। পাশে ইয়াব্বড় এক টিপিন ক্যারিয়ার।

তাতে কী আছে আমরা হলফ করে বলতে পারি।

- টাকি মাছের ভর্তা। পাটায় ছেঁচা পুদিনা পাতার রস। সাদা ভাত। ডিম ভেঙে রান্না করা কলইয়ের ডাল। গরুর গোশতা ভূনা।

হুযুরও ঘুমের মধ্যেই বুঝে যান কী হচ্ছে। চোখ না খুলেই মিটিমিটি হাসেন। এদিন আর উঠে পড়ার জন্য তোড়জোড় করেন না।

- কিরে কুরআন শরীফ ইয়াদ হয়েছে?

- জ্বি হুযুর। পড়া শুরু করেছি।

- তাহলে এখন চলে যা। শবে বরাতের আগের দিন দেখা করিস।

তখন আর আদিলকে আর পায় কে? তার তারাবিহের মিশন সাকসেসফুল।

শবে বরাতের আগের দিন আদিল লাজুক মুখে হাযির। কেমন জামাই জামাই ভাব। প্যান্টের বদলে ঢিলেঢালা পায়জামা। এমব্রয়ডারি করা পাঞ্জাবির বদলে ওর গায়ে এখন ফিনফিনে পাতলা শাদা জামা। গলায় একটা লাল রুমালও পরম যত্নে রাখা। বুক পকেটে জোনাকি পোকার বদলে মিসওয়াক। একেবারে ষোলআনা হুযুরিয়ানা।

পুরো রামাদানে দিনের বেশিরভাগ সময় মসজিদে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত। জোহরের পরে আমাদের সাথে ঝুলোঝুলি:

- একটু পারাটা শুনে দেনা।

- না পারবো না। আমার পারাই ইয়াদ হয়নি।

- একটু শোন না, দোস্ত!

তার জোরাজুরিতে পার পাওয়া মুশকিল। মাঝেমধ্যে মসজিদে আযানও দিতে দেখা যায় তাকে। মুয়াজ্জিন সাহেব তো বেজায় খুশি। ছেলেটা লায়েক আছে। ময়-মুরুব্বির প্রতি সম্মান রাখে। কুরআনের খতম আসলে তাই তাকে না হলে মুয়াজ্জিন সাহেবের চলে না।

- হাফেজ আদিল কই?

- এই তো, এখানে চাচা।

- তুমি আমার পারাগুলো একটু পড়ে দাও। আমার বাজারে যেতে হবে।

- ঠিক আছে চাচা, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক ঠিক পড়ে রাখবখন।

হুযুর খুশি, মুয়াজ্জিন খুশি। এমনকি আমরাও খুশি। রাতে, যে যার মসজিদ থেকে তারাবীহ শেষ করে আসলেই, হযুরের পা টিপে, মাথায় তেল লাগিয়ে, মশারি ঠিকমতো গুঁজে আমরা চম্পট। ফাইভ স্টার হোটেল কিংবা মিষ্টাঙ্গনে।

দোকানে ঢুকতেই লেখা:

কী খাবেন ? মিষ্টি না মিরিন্ডা?

বলে কি, দুটোই খাবো।

খাওয়া শেষে বিল সেই আদিলই দিবে। সুতরাং কুছ পরোয়া নেহি। খাওদাও। বাত জমাও, ইয়ার। এভাবে রামাদান শেষ হয়। চাঁদ উঠলেই আদিল হাওয়া। তার আর দেখা নেই। সোজা সেলুনে। ক্ষৌরকর্ম সম্পাদনে ব্যাপৃত। সেলুন থেকে মার্কেটে। নতুন ডিজাইনের কী প্যান্ট এলো, সেটা কিনতে হবে যে।

আদিলের রঙ বদল অবশ্য সাতাশ তারিখে তারাবীহের টাকা হাতে পাওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে হতে থাকে। আরো দুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কারণ এ দুদিন দিনেও বেশ কিছু দাওয়াত পড়ে। ওখানেও মোটা আয়।

০৯

ক'দিন পরই রামাদান। অফুরন্ত সম্ভাবনার মাস। কল্যাণের মাস। অগুনতি সওয়াবের মাস।

রামাদান এমন এক মেহমান, যার আগমনে চারদিকে সাজসাজরব পড়ে যায়। মুমিনদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। খুশির বান ডাকে। বছরে একবার আসে এই মেহমান। স্বল্প সময়ের এই মহান অতিথিকে সাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত পুরো মুসলিম বিশ্ব।

রামাদান এমন এক মেহমান যার আগমনে সমস্ত আসমান ও যমিনে সাড়া পড়ে যায়, সমস্ত মুমিনের অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়! এই মেহমান বছরে একটি বারই আসে আমাদের কাছে। খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের মাঝে অবস্থান করে!

এই সন্মানিত অতিথির সন্মান ও আতিথেয়তার হক আদায় করার জন্য যথাযথ মর্যাদা রক্ষার জন্য সবাই চেষ্টা করে। আমরা তো প্রত্যকেই কিছু না কিছুর জন্য অপেক্ষা করি বা করতে দেখি! পিতামাতা সন্তানের জন্য অপেক্ষা করেন। স্ত্রী তার প্রিয়তম স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেন। বোন ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করেন। ছাত্র ছাত্রী তাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেন।

রমাদান মাস থেকে যতটা ফায়দা অর্জন করার নিয়্যাত করবো, ঠিক ততটা প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। ইনাশাআল্লাহ।

১০

রামাদানের প্রস্তুতিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১: ব্যক্তিগত প্রস্তুতি।

২: পারিবারিক প্রস্তুতি।

৩: সামাজিক প্রস্তুতি।

ব্যক্তিগত প্রস্তুতিঃ

১: রামাদানকে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা। সে অনুযায়ি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা হলো আয়নার মতো। আমি নিজেকে আয়নাতে যত সুন্দর দেখতে পছন্দ করি আমার পরিকল্পনাটি যেন সেরকম সুন্দর হয়।

প্রথমেই নিয়ত সহিহ করি, ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, দু'আ করি তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। যাতে আমি যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। তা বাস্তবায়ন করতে পারি। আমলের মাধ্যমে শুধু তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারি।

২: কুরআন কারীম শুদ্ধ করার পরিকল্পনা করা। নিয়মিত তিলাওয়াত করা। কুরআন কারীম খতম করার পরিকল্পনা করা। কুরআন কারীম খতম করা খুবই সহজ। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে মাত্র চার পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করলে ৩০ দিনে খতম করা সম্ভব।

৩: কুরআনে হাফিয না হলে, প্রতিদিন কিছু কিছু হিফয করার চেষ্টা করতে পারি।

৪: রমাদানের সিয়ামের গুরুত্ব অনুধাবন করা। উৎসাহ-উদ্দিপনায় সিয়াম সাধনার জন্য মনকে প্রস্তুত করে নেয়া। হাদিসের কিতাব থেকে কিতাবুস সাওম পড়ে নিতে পারি। রোজার মাসায়িলগুলো মনে রাখার জন্য এ বিষয়ে একটা বই পড়ে নিতে পারি।

৫: নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি কাজগুলো আগেই সেরে নিতে পারি। বিশেষ করে ভারি কাজগুলো।

৬: রমাদান মাসের প্রয়োজনীয় বাজার, ঈদ পরবর্তি শুকনো ভারি বাজার গুলো আগেই তালিকা করে সেরে নিতে পারি ।

৭: আব্বু-আম্মু, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনদের সাথে রামাদানের আগেই অন্তত একবার হলেও টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারি। তাদের কাছে দু'আ চাইতে পারি।

৮: এই রমাদানে, আল্লাহর রাস্তায় আমি কী পরিমানে সাদাকা করব তা নির্ধারন করে রাখতে পারি। গরিব আত্মীয়স্বজন, গরিব প্রতিবেশি, মসজিদের ইফতারে শরিক থাকতে পারি।

৯: বেশি বেশি দু'আ করতে পারি। রমাদান মাস তো দুয়া কবুলের মাস! রামাদান উপলক্ষে বিভিন্ন সময় পড়ার দু'আগুলো শিখে নিতে পারি। চাঁদ দেখার দু'আ কি আমরা সবাই পারি?

১১

পারিবারিক প্রস্তুতিঃ

১: ঘরোয়া তা'লীমের মাধ্যমে রমাদানের মাহাত্ম্য, ফাজায়েল ও করনীয় আলোচনা করতে পারি।

২: পরিবারের ছোট বড় সবাইকে নিজ নিজ প্রস্তুতির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারি। তাদের প্রস্তুতি গ্রহনে সাহায্য করতে পারি।

৩: পরিবারের সবাই মিলে কাজ গুলো ভাগ করে নেয়া, একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

সামাজিক প্রস্তুতিঃ

১: নিজ প্রতিবেশিদের খোঁজ নিতে পারি। তাদের সাথে রমাদানের প্রস্তুতিমূলক আলচনা করে তাদেরকেও সহায়তা করতে পারি।

২: স্থানীয় মসজিদগুলোতে রামাদান কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করতে পারি। যারা ইতিকাফে বসবেন তাদের খিদমাতে এগিয়ে আসতে পারি।

৩: রামাদানের পুর্বেই রোযানা তা'লীমের মাধ্যমে রামাদান বিষয়ক আলোচনা করতে পারি। ঘরের মা-বোনদের জন্যও আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারি।

৪: সবাই মিলে সমাজের অবহেলিত, অনাহারী মানুষগুলোর জন্য সেহেরি ও ইফতারের ব্যবস্থা নিতে পারি। এ ব্যাপার একে অপরকে উৎসাহিত করতে পারি।

১২

রামাদান আসলে মাথায় ওড়নার পরিমাণও বাড়ে। কি টিভি, কি সংবাদপাঠ, সব জায়গায় ওড়নার ছড়াছড়ি না হলেও তুলনামূলক বেড়ে যায় তো বটে। ওড়না দেয়ারও বিভিন্ন কায়দা আছে, কেতা আছে। স্টাইল আছে। ফ্যাশন আছে। মান আছে। পরিমাণ আছে। কেউ বা ওড়না দেয়া পুরো মাথা ঢেকে। কেউ বা মাথার চারভাগের তিন ভাগ। কেউ দুইভাগ। কেউ একদন পেছনে পেছনের চুলগুলো ঢাকা যায় কি যায় না।

একবার:

আমরা বসে আছি গোল হয়ে। প্লেটোর রিপাবলিক নিয়ে জটিল সব আলোচন চলছে। সরদার ফযলুল করীম বইটা অনুবাদ করেছেন। তিনি তো এই তো কয়দিন আগে মারা গেছেন। বড় ভাইরা জটিল সব আলোচনা করছেন। তাদের আলোচনার ছিঁটেফোঁটা কিছু কানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কিছু মাথার তুলি ঘেঁষে যাচ্ছে। কিছু যাচ্ছে মাথার অনেক ওপর দিয়ে, ধরাছোঁয়ার বাইরে দিয়ে।

এমন সময় আযান হলো। সাথে সাথেই আমাদের সাহিত্য সভায় থাকা মেয়েদের কয়েকজন মাথায় ওড়না টেনে দিলো। অথচ এতক্ষণ দুনিয়ার হেন বিষয় নেই আলোচনা হয় নি। আযান হতেই বোনদের অবচেতনে ধর্ম প্রবণতা জেগে উঠলো। এই বোনেরা কুরআন পড়তে পারে না। নামায তো পড়েই না। তারপরো এটুকু ধর্মচেতনা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। আযান শেষ হতেই আবার ওড়না নামিয়ে দিলো। আড্ডাশেষে জিজ্ঞাসা করলাম:

এই যে উর্মি! শুনুন

- জ্বি, বলুন

- কিছু মনে করবেন না, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

- কোনো সমস্যা নেই। বলুন।

- প্রতি শুক্রবারে আমাদের আড্ডা চলাকালে আযান হলে দেখি আপনি মাথায় ওড়না টেনে দেন। কিন্তু আপনি তো ধর্ম মানেন না বলেই জানি।

- ওড়না টেনে দিই আসলে অভ্যাসবশত। ভালো লাগে।

- ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

১৩

গাড়িতে। চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ির পথে। গাড়িতে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম-হিন্দু-উপজাতি সবাই আছে। এদিন কেনো যেনো উপজাতির পরিমাণই ছিলো বেশি। রামাদান মাস এলে, আগে দেখতাম, উপজাতিরাও প্রকাশ্যে বিড়ি-সিগারেট পান করতো না। এখন অবশ্য সে সবের বালাই নেই। বাস অর্ধেক পথ আসার পর বাসের পেছন তেকে উঁচু গলার আওয়াজ পেয়ে গলা বাড়িয়ে তাকালাম। একজন বিডিআর (সরি, বিজিবি) সদস্য রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ধমকাধমকি করছেন।

- এখন রামাদান মাস জানেন না?

- জ্বি জানি তো।

- তাহলে বিড়ি খাচ্ছেন কেনো?

- আমি তো বৌদ্ধ। আমাদের তো রোজা নেই।

- আপনার রোজা না থাকতে পারে, আমাদের তো আছে?

চাকমা লোকটা উত্তর দিলো:

- আপনি রোজা রেখেছেন, তাই কিছু খাচ্ছেন না। আমি রোজা রাখিনি তাই খাচ্ছি। এতে সমস্যাটা কোথায়?

- আপনার বিড়ির গন্ধে আমাদের সমস্যা হচ্ছে।

তাদের তর্ক চলতে থাকুক। আমরা বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবি। একজন বিধর্মীকে আমরা, এ বিষয়ে জোর করতে পারি কিনা? শরীয়ত কী বলে? রামাদানে, এভাবে দুর্ব্যবহার করে, প্রকাশ্যে কিছু খেতে বাধা দিলে, একজন বিধর্মীর মনে ইসলাম ও মুসলিম নিয়ে ভাবমূর্তিটা কেমন হবে?

১৪

একটা লেখায়, মুসলিম বোনেরা কিভাবে রামাদানের প্রস্তুতি নিবেন, তার একটা তালিকা পেলাম।

১: রামাদানের আসার আগেই ঘরের ভেতর-বাহির ভালভাবে পরিষ্কার করে রাখতে পারি। রামাদানে যাতে শুধু ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকা যায়।

২: রামাদানের আগেই যাবতীয় বাজার-সদাই করিয়ে রাখা। আখিরাতের বাজারের সময় যাতে দুনিয়ার বাজারের পেছনে ছুটতে না হয়। ঈদের প্রস্তুতিও কিছুট সেরে রাখা যেতে পারে। তাহলে শেষ দশকের মহাপবিত্র রজনীগুলোও খালিস ইবাদতে কাটানো সহজ হবে।

৩: রাদামানটা হতে পারে সব ধরণের পরিবর্তনের সূচনা। আরো ভালোর দিকে যাওয়ার সূচনা। যাবতীয় নেতিবাচকতা থেকে মুক্তির সূচনা। ব্যক্তিগত সমস্যা ও পারিবারিক ঝামেলা থেকে মুক্তির সূচনা।

৪: ঈমান বিধ্বংসী চ্যানেলগুলো বন্ধ রাখা যেতে পারে। তাহলে ঘরে ইবাদতের পরিবেশ অটুট থাকবে। সব ধরণের সিরিয়াল থেকে দূরে থাকা। দিনে রাতের যাবতীয় হারাম অনুষ্ঠান থেকে থাকাটাও জরুরি।

৫: রামাদানে ঘরে ভিন্নধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ছোটরা যাতে এই পবিত্র মাসের অধ্যাত্মিকতা আর পবিত্রতার ছোঁয়া পেতে পারে।

৬: ছোটদেরকে তারাবীহের জন্য জাগিয়ে রাখা যেতে পারে। সেহেরির জন্য জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। তারা এ দুইয়ের সৌন্দর্য দেখে অভ্যস্ত হবে। পরে আমলে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৭: ছোটদেরকে বেশি বেশি তিলাওয়াত, দু'আ, ইস্তিগফারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। অন্তত সামান্য সময়ের জন্য হলেও।

৮: পরিবারের ছোটবড়-ছেলেমেয়ে সবাইকে ইফতারি তৈরিতে শরীক করা যেতে পারে। সামান্য এক গ্লাস পানি এনে দিয়ে হলেও। এটা তার অন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতার বীজ বপন করবে। অন্যকে ইফতার করানোর সওয়াব লাভে উৎসাহিত করবে। তাকে তার একজন রোজাদার বন্ধুকে দাওয়াত দিতে বলা যেতে পারে।

৯: আমরা দু'আকে দাওয়া করবো না। অর্থাৎ প্রয়োজন হলেই আমরা ওষুধ খাই। আর বিপদে পড়লেই আমরা দু'আ করি এমনটা যাতে না হয়। বরং দু'আকে আমরা হাওয়া বা অক্সিজেনের মতো করে ফেলবো। সর্বাবস্থায়, সব সময় দু'আ করবো।

১৫

রামাদানে সালফে সালিহীনের অবিশ্বাস্য ইবাদত বন্দেগির কিছু খণ্ডচিত্রঃ

১: রামাদানে, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রহ.) প্রতি দুই রাতে এক খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন। তিনি মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত ঘুমাতেন। বাকি সময় ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। রামাদানের বাইরে তিনি প্রতি ছয় রাতে এক খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন।

২: মালিক বিন আনাস (রহ.) রামাদান আসলেই হাদীসচর্চা থেকে, বিভিন্ন ইলমি মজলিস থেকে রীতিমতো পালিয়ে যেতেন। সারাক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন।

৩: সুফইয়ান সাওরি (রহ.) রামাদান এলে, সমস্ত নফল ইবাদত ছেড়ে, কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন।

৪: সায়ীদ বিন জুবাইর (রহ.) প্রতি দুই রাতে এক খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন।

৫: কাতাদাহ (রহ.) এমনিতে সাত দিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রামাদান এলে তিন দিনে এক খতম দিতেন। আর শেষ দশকে প্রতি দিন এক খতম।

৬: রবী‘ বিন সুলাইমান (রহ.) বলেছেন: ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সাধারণত মাসে ত্রিশ খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু রামাদান এলে তিনি ষাট খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

৭: ওয়াকী‘ বিন জাররাহ (রহ.) রামাদানে প্রতিদিন এক খতম এবং এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বারো রাকা‘আত চাশতের নামায আদায় করতেন। জোহর থেকে আসর পর্যন্ত নফল নামায আদায়ে কাটিয়ে দিতেন।

৮: মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারি (রহ.) রামাদানে প্রতিদিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তারাবীহের পর নামাযে দাঁড়িয়ে প্রতি তিন রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ সময়ে, যেমন রামাদান এর আওতামুক্ত। আবার বিশেষ স্থানও এই নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত। যেমন কেউ মক্কায় গেলে বেশি বেশি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে পারবে।

১৬

হাফিজ ইবনে রজব (রহ.) বলেছেন, প্রশংসিত ‘সবর’ কয়েক প্রকার।

১: আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে সবর করা।

২: আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচতে গিয়ে সবর করা।

৩: আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর সবর করা।

আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সবর এবং হারাম বেঁচে থাকার জন্য সবরই উত্তম সবর। তারপর হলো তাকদীরের উপর সবর করা। এর চেয়েও উত্তম সবর হলো: সিয়াম।

সিয়ামের মাঝে উপরোক্ত তিন প্রকারের সবরই বিদ্যমান।

- সিয়ামের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য আছে।

- সিয়ামের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার সবর আছে। বান্দা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও গুনাহ পরিহার করে। প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে। এজন্যই হাদীসে আছে: সিয়াম ছাড়া, বনি আদমের সমস্ত আমলই তার নিজের। শুধু সিয়ামটাই আমার (আল্লাহর) জন্য। আমিই তার প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে তার জৈবিক চাহিদা পরিহার করেছে, তার খাবার বর্জন করেছে, তার পানীয় থেকে বিরত থেকেছে শুধুই আমার জন্য।

- সিয়ামের মধ্যে তাকদীরের নির্ধারিত কষ্টের উপর সবরও আছে। কারণ সিয়ামের মধ্যে ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে।

হাদীসে আছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ সিয়ামের মাসকে সবরের মাস বলে ডাকতেন। (জামিউল উলূমে ওয়াল হিকাম)

১৭

রামাদান মাস। সবাই রোজা। আলোচনা সভায় বসে আছি। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিলো: 'শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে বাংলার রেনেসাঁ'।

সবাই যে যার মতো আলোচনা করেছে। মত দিয়েছে। আমি শিল্প-বিপ্লব আর ফিরআওনদের পিরামিড নির্মাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না। উভয়টার ভিতই মানবতাকে দলে-মলে দাঁড়িয়েছে। সবাই বলে রেনেসাঁর মূল বক্তব্য নাকি মানবতার মুক্তি। আরে ছে: ছে:। এসব ছেঁদো কথায় আমার বমি আসে। যাক এসব আলোচনা

পরে হবে। আমি বলি শিল্পবিপ্লব তো শুরু হয়েছে স্পেনের মুসলিম সভ্যতা থেকে। তেনারা আবার এটা মানতে নারাজ। তো আমাদের আকাশকুসুম অর্থহীন আলোচনা শেষ হলো। আমার কাছে তখনো মনে হতো, এখনো মনে হয়, এই যে এতসব বিষয়ে গালভরা বুলি, উচ্চাঙ্গের যতসব আলোচনা, এর না কোনও দুনিয়াবি ফায়দা আছে, আর না আছে আখিরাতের ফায়েদা।

শুধু এক ধরণের বায়বীয় অহম বোধ হয়: 'অনেক কিছু জেনে গেলাম রে!। কত জ্ঞানের কথা জেনে গেলাম!' আর মনে মনে ভাবি, মাদরাসায় আসলে কিছুই পড়ানো হয় না। আমার এসব ভাবনা দেখলে হাসি পায়।

যে কথা বলতে বসলাম, তা হলো: আমাদের আলোচনা শেষে অন্যদিনের মতোই এ কথা সে কথার পর রোজা নিয়ে আলোচনা উঠলো। কে কে রোজ রেখেছে, আর কে কে রোজা রাখে নি। দেখা গেলো প্রায় সব মেয়েরাই রোজা রেখেছে, আর অধিকাংশ ছেলেরাই রোজা রাখেনি। আমি মেয়েদেরই একজন, যোবেদাকে প্রশ্ন করলাম,

- আচ্ছা! সব রোজাই কি রাখবেন?

- হ্যাঁ রাখবো!

- নামাজ পড়েন?

- নাহ্, নামাজ পড়ি না। পড়তে ইচ্ছা করে না।

- দেখুন, রোজা, নামাজ, পর্দা সবই কিন্তু একই মাত্রার ফরজ। আবশ্যক কর্তব্য।

- নামাজ পড়া তো ঝামেলার কাজ। আর হিজাব? ওরে বাবা! ওটাতো বস্তাবন্দী হয়ে থাকা। এর চেয়ে জেলখানায় থাকাও আরো সহজ। আর হিজাব পড়তে হবে কেনো? পাপ তো থাকে মনে। আমি মনে মনে পাপচিন্তা না করলেই হলো।

- আচ্ছা! আপনি কুরআন মানেন?

- হ্যাঁ, মানি।

- তাহলে আপনি এই আয়াতকেওতো মানতে হবে:

‘তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? তাহলে বলো, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমার যা-কিছু করো আল্লাহ সে সম্পকে উদাসীন নন (সূরা বাকারা:৮৫)

এরপর আর কোনও জবাব নেই। আমতা আমতা।

এই ধরনের মানুষকে আমি দোষ দিই না। দোষ আমাদের কি না সেটা নিয়েই আমি চিন্তিত। আমরা যারা ধর্ম নিয়ে থাকি, তারাই কি ঠিকমতো ধর্ম পালন করছি?

১৮

চাঁদ দেখা তো নয়, ফাঁদ দেখা। শা‘বান মাস আসলেই বুকে ঢিপ ঢিপ। কিতাব খানার ছাত্ররা সবাই বাড়ি যাবে, আর আমরা হিফযখানার ছাত্ররা ‘বন্দী কারাগারে’।

কিতাবখানার পরীক্ষা শেষ। তাদের পাক্কা দেড়মাসের ছুটি। আর আমরা? হেলতে

দুলতে থাকো। রামাদান আমাদের কাছে এক বিভীষিকা হয়ে আসতো। বিশেষ করে যারা পনের পারার বেশি হিফয হয়েছে তাদের কাছে। যাদের খতম শেষ হয়েছে তারা যেনো জামাই। সারাদিন তারাবির পার মুখস্থ করতে করতে করতে করতে প্রাণপাখি নির্গত হওয়ার যোগাড় হতো। পারাটা কতোবার, কতোজনের কাছে যে শোনানো হতো তার ইয়ত্তা নেই। বিনা লোকমায়, বিনা আটকায়।

এরপরও কি ধড়ফড়ানি কমে? ইফতার ছিলো বিষবৎ। গলা দিয়ে এত এত সুখাদ্যকে অখাদ্য আর কুখাদ্য মনে হতো। গলা দিয়ে নামতে চাইতো না। ইশ! ইফতারটা যদি ঈশার আগে হতো! ইফতারের পর থেকেই শুরু হয়ে যেতো, মহা মহা ঘটনা। মাগরিবের নামায পড়ে মুসল্লিরা যখন বের হয়ে যেতো, আমাদেরকে দাঁড়াতে হতো আউয়াবীনে। নিয়্যাত বাঁধলাম। সানা পড়ছি, সূরা ফাতিহা শুরু করতে একটু দেরি হয়েছে, আর যায় কোথায়

- সপাং! সপাং! এই কিরে সূরা ফাতিহাও ভুলে গেলি? তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পড়।

একজনকে বাড়ি দিলেই বাকিরা সানা পর্যন্ত বিকট আওয়াজে পড়া শুরু করে দিতো। পুরো মসজিদ যেনো বিস্ফোরিত হলো। সানা পড়া শেষ হলো। ফাতিহা পড়া শেষ হলো। এরপর শুরু হলো পারা পড়া। যেটা আজকের তারাবীতে পড়বো।

সামান্য একটু ঢোক গেলার জন্য থেমেছি। হুযুর হয়তো বিরাট মুগুর হাতে টহল দিতে দিতে সবে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি ঢোক গিলছি বা নিশ্বাস টানছি, আর নিস্তার নেই:

- কিরে সারাদিন কি করেছিলি। সারা বছর কি করেছিলি। সাত সবক ঠিক মতো শোনালি না কেনো। আমুখতা আধা পারা করে শোনানো না? বলেছিলাম না একপারা

করে শোনাতে? কথা কানে যায় নি? সাপ্তাহিক সবীনার দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলি কেনো?

হুযুর মুখ দিয়ে একেকটা প্রশ্নের ট্রিগার টিপছেন আর পিঠে দমাদম মুগুরে কামান দাগছেন। এভাবে দুই রাকাআত নামায পড়া তো নয়, যেনো পুলসিরাত পার হওয়া। সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দেয়া। এতো গেলো আউয়াবিনের পর্ব। এতো ভূমিকা, মুকাদ্দিমা। তামহীদ। তারাবীহের জন্য মাঠ পর্যায়ের তৃণমূল প্রস্তুতি। ওয়ার্মআপ। প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ।

এরপর আসবে তারাবীহ। ফাইনাল ম্যাচ। তারাবীহের জন্য, হুযুরের বিশেষ আলমারি থেকে নধরকান্তি, নাসুসনুদুস আরেকটা নতুন বেত বের হবে। ওই বেতটা হুযুর সারা বছর তারাবীহের জন্য 'তা' দিয়ে রেখে দেন। রামাদান শেষে আবার আলমারিতে রেখে দেন। মাঝেমধ্যে তেল মাখিয়ে রোদে শুকোতেও দেন। আমাদের আউয়াবীন শেষে হালকা নাস্তার ব্যবস্থা থাকতো। আহ্ মনে হতো অমৃত-গরল গিলছি। খাবারটা হতো খুবই মজাদার। কিন্তু তারাবীহের সেই মূর্তিমান 'তানবীহুল গাফিলীন' এর ভয়ে সরল খাবারটাই গরলে পরিণত হতো।

এত ভয়ের মাঝেও আনন্দ হতো, খুনসুটি হতো। আউয়াবীনে কে কয় বাড়ি খেলো তার হিসেব হতো। যে যতো বেশি বাড়ি খেতো সেই আজকের হিরো। বেশি মার খাওয়াটা আমাদের গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। যে একটা বাড়িও খায়নি তার দিকে সবাই করুণার দৃষ্টিতে তাকাতো। আহ্ বেচারা! নাবালক। পরদিন এই নাবালকটা সাবালক হওয়ার জন্য পড়া পারলেও, হুযুর যখন রামদা হাতে পিছন দিয়ে যেতেন, ইচ্ছে করেই আটকে যেতো। ব্যস, নামাজ শেষে বুক ফুলিয়ে, মুখ চিতিয়ে সে কি হম্বিতম্বি! ভাবখানা এই, দেখ দেখ, কেমন মারটা খেলুম আজ।

১৯

- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

- ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

- হে লোকেরা! দীর্ঘ এগার মাস পর আমি আবার তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি।

- জনাব! আপনি কে?

- আমি তোমাদের মেহমান। আমি তোমাদের কিছু দিনের বন্ধু। তোমাদের কল্যাণকামী। আমি ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। ঈমানের আলো একটা একটা ঝলক।

- আপনার নাম কী?

- আমার নাম রামাদান। কালের সন্তান। দিনসমূহের নাতি। শা'বানের ভাই।

- আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

- আমি রাহমানের কাছ থেকে এসেছি। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।

- আপনি কোথায় বাস করেন?

- আমি মুমিনগণের কলবে বাস করি। মুত্তাকীদের দেশে বাস করি। সতকর্মশীলগণের পাশে থাকি।

- আপনার বসবাসে কোনও সমস্যা হয়? আমাদের তো কত সমস্যা!

- হাঁ, আমি সব বাড়িতে যাই। অনেক আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়েই যাই। কিন্তু আমাকে অনেক কৃপণরা তাড়িয়ে দেয়। দুর্ভাগারা তাড়িয়ে দেয়। অনেক ধনীরা তাড়িয়ে দেয়। আমি তাদের অবহেলায় নিরাশ হই না। আমি খুঁজতে থাকি কে আমাকে ভালোবাসে। খুঁজতে খুঁজতে দেখি মুমিন, মুত্তাকি, পূণ্যবানরা আমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আছে।

- আপনি কতদিন বেড়াবেন?

- এই ধরো, একমাস!

- আপনার মুসলমানদের কাছে এসে কী করেন? আপনার কর্তব্যটা কী?

- আমার কাজ হলো চাষাবাদ করা। শিল্পকর্ম তৈরি করা। চিকিতসা করা। শিক্ষাদান করা।

- কিভাবে?

- **চাষাবাদ:** আমি মানুষের হৃদয়ে ঈমান বপন করি। অন্তরে ভালোবাসা রোপন করি। মানুষের স্বভাবে উত্তম আখলাকের বীজ বয়ন করি। বীজগুলোকে পবিত্রতা ও ইখলাসের পানি দিয়ে সিঞ্চিত করি। বীজগুলোকে উন্নত চরিত্র আর সতকর্ম দ্বারা আহার যোগাই। বীজগুলো থেকে কল্যাণ আর প্রশান্তির বৃক্ষ অংকুরিত হয়। সে বৃক্ষ থেকে সাফল্য-সওয়াবের ফল আহরণ করি। পাশাপাশি আমি মানুষের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ-ঈর্ষার কাঁটা ছেঁটে ফেলি। মানুষের অন্তর থেকে ধোঁকা-প্রবঞ্চনা-অনিষ্টের আগাছা বেছে ফেলি। ফলে মানুষের অন্তরে ভালোবাসা, সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

- ইশ! কত সুন্দর আর কল্যাণময় চাষাবাদ।

- **শিল্পকর্ম:** আমি শক্তিমান শরীর সৃষ্টি করি। পরিশুদ্ধ আত্মা সৃষ্টি করি। মানুষের মাঝে কর্তিত সম্পর্কগুলো মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করি। তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করি। সবাইকে সাম্য ও ন্যায়ের পটভূমিতে একত্রিত করি। ফরে বড় বড় বীর তৈরি হয়। যারা শত্রুদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মাঝে কোমল।

২০

অনন্য রামাদানঃ

১: রামাদানে আমরা তারাবীহের স্বাদ উপভোগ করি। অনেক বেশি রাকা'আত পড়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। অনেক বেশি সাজদা করা সৌভাগ্য নসীব হয়। দীর্ঘ সময় আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো তাওফীক হয়। অন্য মাসের তুলনায় দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে মাসজিদে সময় কাটানোর সুখময় সৌভাগ্য লাভ হয়।

২: রামাদান এলে অন্য মাসের তুলনায় বেশি বশি তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক নসীব হয়। অন্য মাসের তুলনায় বেশি বেশি আযান-ইকামত শোনার সৌভাগ্য হয়।

৩: বারবার পাশাপাশি নামাযে দাঁড়ানোর ফলে সামাজিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। হিংসা-বিদ্বেষ কমে যায়। বেশি বেশি মসজিদমুখী পদচারণার সাওয়াব হয়। ফলে আল্লাহর রহমত নেমে আসে।

৪: রামাদানে ইবাদত বন্দেগি বেশি হওয়ার কারণে মনে আনন্দ-স্ফূর্তি থাকে। ঝগড়া-বিবাদ কমে যায়। বেশি বেশি তাসবীহ পাঠ হয়। বেশি বেশি দু'আ-দুরূদ পঠের তাওফীক হয়।

৫: রামাদান এলে সবাই চায় এক খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে। বেশি বেশি কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে। যারা কুরআন কারীম পড়তে পারে না, তারাও নতুন করে কুরআন শিখতে চায়। যারা কুরআন কারীম বোঝে না, তারাও চায় কুরআন কারীম বুঝতে।

৬: রামাদান এলে আল্লাহর নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। রোগ-বালাই কমে যায়। অন্য মাসের তুলনায় রুজি-রোজগার বৃদ্ধি পায়।

৭: রামাদান এলে অন্য রকমের এক ধরনের আবেগ-অনুভূতি জন্মে। কী এক অপার্থিব সুখ বিরাজ করে।

৮: রামাদান এলে গুনাহের পরিমাণ কমে আসে। গুনাহের চিন্তা কমে আসে।

৯: রামাদান এলে দান-খয়রাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরোপকারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

১০: রামাদান এলে দ্বীনি কথাবার্তা বলা ও শোন বৃদ্ধি পায়।

১১: রামাদান এলে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত একটা পরিবর্তন ধরা পড়ে।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে রামাদানকে যথাযথ ইহতিরাম করার তাওফীক দান করুন। আমীন

২১

নৃশংসতম রামাদানঃ এবারের (২০১৪ সালের) রামাদান মুসলিম ইতিহাসের নৃশংসতম রামাদান।

১: কায়রোতে শত শত মুসলিম ফাঁসির অপেক্ষায়।

২: দিমাশকে লাখ লাখ মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে।

৩: আরাকানে অসংখ্য মুসলিম আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে।

৪: মধ্য আফ্রিকায় লাখ লাখ মুসলমান রক্তে ভাসছে।

৫: চিনের মুসলমানরা অবরুদ্ধ।

৬: গাযা উপত্যকার পুরোটাই কসাইখানা।

৭: ইরাকের সুন্নিরা রক্তসাগরে ডুবে আছে।

৮: কাশ্মীর আজ পুরোটাই ভারতের সেটা ছাউনিতে পরিণত হয়েছে।

আর মুসলমানরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার বিজয়ের জন্য দু'আ করছে। ইয়া রাব! দিলে মুসলিম কো ওহ্ যিন্দা তামান্না দে। আমীন।

২২

মাদরাসা বন্ধ। মাদরাসায় আর কেউ নেই। নামাজের সময় বাহির থেকে কয়েকজন মুসল্লি আসেন। রামাদানের পনের তারিখ পর্যন্ত মাদরাসা ছিলো জমজমাট। এরপরও আজ মানে বিশ তারিখেও জোহর পর্যন্ত অনেকেই ছিলো। তাফসীরের দরস তো বিশই রামাদান পর্যন্ত চলে। নাহু-সারফের তাদরীবও শেষ হয়ে গেলো।

আমরা দুজন হাফেয আটকা পড়ে গেছি। এখনো যে খতম শেষ হলো না। সবার বাড়ি যাওয়া দেখে মনে হতে লাগলো, ইশ! হাফেয না হলেই বোধ হয় ভালো হতো। হিফজখানাও ছুটি হয়ে গেছে। আমাদের হুযুরও চলে গেছেন। আপন সাথীরাও চলে গেছে। হিফযখানাটা খোলা থাকলেও না হয় সময়টা কাটাতে কোনও সমস্যা হতো না। হুযুরের সাথে কথা বলে সান্তনা পাওয়া যেতো।

আমরা, দুই হাফেয একবার চেষ্টা করেছিলাম বিশ তারিখেই খতম শেষ করে দিতে। ধরা পড়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। মাদরাসায় কোনও হুযুর নেই। আমরা দুই হাফেযই মাদরাসার মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম, বোর্ডিং হুযুর। সব। খেলাধূলা, গল্পগুজব আর ঘোরাফেরা শুরু হয় ফজর পড়ে, শেষ হয় গভীর রাতে। কুরআন কারীম ইয়াদের কোনও চাপ নেই। যেখানে একবসায় পুরো কুরআন শোনাতে পারি, দুজনেই, সেখানে পড়তে হবে কেনো?

সারাদিন কোনও কাজ নেই। তখন থেকেই, বই পড়তে শিখে যাওয়াতে, হাতের কাছে বই যা ছিলো একটা অনেকবার করে ‘খতম’ দেয়া হয়ে গেছে। গ্রামের মাদরাসা। বাড়তি বই সংগ্রহেরও কোনও সুযোগ নেই। শহরে গেলে যে কয়টা আনতে পারি, সে

কয়টাই জাবর কাটতে হয় অনেক দিন। তদুপরি পকেটেরও তো ‘এনার্জি’ থাকতে হবে! নাকি? বিশ তারিখের পুরো দিনটাও এভাবেই কেটে গেলো। আসর পড়লাম। নামকাওয়াস্তে, লোকদেখানো গোছের, একবার কুরআন নিয়ে বসলাম। এরপর যেতে হবে জায়গীর বাড়িতে। ইফতারের জন্য। মাদরাসার পাশেই। সামান্য হেঁটে গেলেই ও বাড়ি।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করে মাদরাসার ফটক দিয়ে বের হচ্ছি। পাশের জমিতে সামান্য গোল্লাছুট খেলে তারপর জায়গীর বাড়িতে যাবো। এমন সময় হুযুর এসে নামলেন। রিকশা থেকে। এখন বন্ধ। তাই হুযুরকে দেখে পালানোর প্রয়োজন নেই। বড় গেছি, বড় হয়ে গেছি ভাব নিয়ে, পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। খোলার পর অবশ্য অবস্থা আবার পাল্টে যাবে। হুযুর মিহি কণ্ঠে ডাক দিলেনঃ

- বাবা! এমুই আয়ছে এক্কানা!

আরে হুযুর এমন চালের গুঁড়োর মতো মিহি ডাকও ডাকতে পারেন? আমি তো অবাক? বাজখাঁই গলার বদলে দিলখাই সুর শুনে আমি মোহিত। দৌড়ে গেলাম। হুযুরের হাতের ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিলাম। ফাঁক দিয়ে আড় চোখে দেখে নিলাম, ভেতরে কী আছে, এমনিতে অন্যসময় হলে দেখতাম না। মাদরাসা বন্ধ থাকলে, মাদরাসাকে নিজের ঘর ঘর মনে হয়। হুযুররাও আপন আপন চেহারায় থাকেন। তদুপরি দেখলাম, ব্যাগের ওপরটা তেলে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। তার মানে ভেতরে ইফতারি আছে। অনেক ইফতারি। এত ইফতারি খাওয়ার মানুষ মাদরাসায় নেই। তাহলে তো বোধ হয়, আমরা দুজনই...

আহ! জিবে জল পানি আরো যা আছে সব এলো। আমি নাচতে নাচতে আর ব্যাগ নাচাতে নাচাতে, হুযুরের পিছু পিছু মাদরাসায় এলাম। যেনো রাণীর হাট থেকে বিরাট এক বোয়াল কিনে আনলাম।

দূর থেকে বেলালকে ব্যাগটা উঁচিয়ে দেখালাম। সেও গুটি গুটি পায়ে এলো। এরপর হুযুর যা বললেন, সেটা শোনার জন্য আমরা দুজনের কেউই কস্মিনকালেও প্রস্তুত ছিলাম না। বিনামেঘে বজ্রপাত, বিদ্যুত চমকানো, ঝড়-তুফান সবই বয়ে গেলো।

- বাবারা! শোন, তোমাদের দুজনের ওপর অনেক বড় একটা দায়িত্ব দিতে যাচ্ছি।

আমি আর বেলাল একবার মুখ চাওয়াচাউয়ি করলাম।

- এবার তো দেখতেই পাচ্ছো, মাদরাসায় কেউ নেই। আছো তোমরা দুজন। বাকিরা মাদরাসার কালেকশনে সারাদিন বাইরে থাকে। রাত-বিরেতে ফিরে আসে।

বেলাল আমার হাতে একটা চিমটি কাটলো। আমিও ওকে একটা কাটতে যাচ্ছিলাম। মাঝপথেই হাত থেমে গেলো।

- প্রতিবার তো মসজিদে একজন হুযুরই ই'তিকাফে বসেন। তোমরা জানো। কিন্তু এবার কেউ নেই। এবার বাবা তোমরা দুজনেই ভরসা। তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই। প্রত্যেক মসজিদেই কাউকে না কাউকে ই'তিকাফে বসতে হয়। না হলে সবাই গুনাহগার হয়। তোমাদের দুজনের একজনকে এবার ই'তিকাফে বসতে হবে। দুজনেই আকাশ থেকে নয়, একেবারে পাতাল থেকে আকাশে লাফিয়ে উঠলাম আঁতকে। প্রাথমিক ধকল সামলে উঠেই দুজনে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রায় দুজনের মুখ দিয়েই একযোগে মহাসমারোহে নি:সৃত হলো:

- বেলালের বাড়ি তো মাদরাসার পাশেই।

- ওর বাড়ি তো দূরেই, তাই সে ...

দুজনেই দেখলাম একই দৃষ্টিকোন থেকে অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছি। বেলালের বাড়ি কাছে, তাই সেই ই'তিকাফে থাকাটা সবচেয়ে ভালো।

বেলাল বললো:

- ওর বাড়ি তো অনেক দূরে। তাই তার ই'তিকাফে থাকাটাই ভালো।

হুযুর পড়ে গেলেন উভয় সংকটে। সেটা সামান্য সময়ের জন্য। সাথে সাথেই হুযুর স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন। স্বগতোক্তি করলেন:

- গরুর কথা শুনে কি হালচাষ করা যায়?

=তোরা দুইজনেই এতেকাফে বইবি। অন যা খেতাবালিশ লই দোঁই (দৌড়ে) মসইদে গল্ল (প্রবেশ কর)। যা যা, বই রইসত কিল্লাই?

শুরু হলো অন্য এক জীবন

২৩

পড়িমরি করে ছুটলাম। পেছন থেকে হুযুর ডাক দিলেন:

- এ্যাই! ইফতার লই যা। এগান তোরগো দোনো জনেল্লাই আইনসি।

দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেলো। আহা এমন বন্দী হতে হবে জানলে জীবনেও হাফেয হতাম না। বেলাল খুশি। ভাবটা এমন, কেমন জব্দ! আমার বাড়ি তো এখানেই। কোনও সমস্যা নেই। তুই মর। এত মজার মজার ইফতার, সব বিষবত মনে হতে

লাগলো। নাকের জল চোকের জল একসাথ করে খেলাম। এত স্বপ্নের মজাদার সব ইফতারও মজা করে খেতে পারলাম না। কত দিনরাত কত স্বপ্ন দেখেছি, একসাথে অনেক পদ দিয়ে ইফতার করবো। আজ যাওবা ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়লো, কিন্তু পেটে সইলো না। সবই কপাল!

মসজিদে বন্দী জীবন শুরু হলো। এটা ভাবতেই কলিজা ফেটে যাচ্ছিলো, দশদিন বের হতে পারবো না। কোথাও যেতে পারবো না। বিকেলে গোল্লাছুট খেলতে পারবো না। বিলালের ওপর রাগে শরীর চিড়বিড় করতে লাগলো। তোর জন্যই আমার এই দশা। কিন্তু ছোট বেলার রাগ আর কতক্ষণই বা থাকে। একসাথে থাকতে হবে যেহেতু, মনোমালিন্য হলে চলবে কী করে? আপোষ রফায় আসতেই হলো। সকাল নাগাদ দুজনের বরফ গলতে শুরু করলো।

ই'তিকাফে থাকতে হলে কী করতে হয় সে সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই। সব সময় দেখে এসেছি, বুড়ো বুড়ো কতগুলো মানুষ বসে বসে ঝিমুচ্ছে। সকাল বেলায় ঘুমচ্ছে। এগারটার দিকে মসজিদের হাউজে গোসল করতে এসে, কথা বলছে। দুনিয়ার সব কথা।

গোসল সেরে এসে প্রায় এক মাইল লম্বা তাসবীহ নিয়ে ঢোক গিলছে। হাত দিয়ে দানা চালছে, মুখে জিকির নয়, কথা। এ রহস্য আমি আজো উদঘাটন করতে পারিনি, যখন কথা বলে তখন কিভাবে দানা চলে? ঠোঁট যে নড়ছে সেটা তো কথার জন্য, আর যদি জিকিরের জন্য ঠোঁট নড়ে, তাহলে কথা কিভাবে বলছে? একসাথে জিকির ও কথা কিভাবে চালানো যায়?

জোহরের সময় দেখি, একজন মসজিদের জানালা ধরে উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে তাসবীহ ঘুরছে। আবার ওজুখানায় বাজার থেকে আসা

ব্যবসায়ীদের সাথে কথাও চলছে। আরেকজন মসজিদের এককোনে নিজের বিছানার সাথে হেলান দিয়ে কাত হয়ে আছেন। হাতে তাসবীহ। তিনি ই'তিকাফে আছেন।

আরেকজন জোরে জোরে গজরাচ্ছেন, অর্ধেক মসজিদ দখল করে টানানো পর্দার এপাশে সাধারণ মুসল্লি দাঁড়িয়েছে বলে। পর্দানশীন ই'তিকাফকারীদের পর্দালঙ্ঘন হয়েছে। নামাজ দাঁড়িয়েছে। ই'তিকাফকারী বুড়োরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। মধ্যখানে কাতারের মধ্যে বিশাল ফোকর। ফাঁক থাকবে নাইবা কেনো? আগেই তো ধাতানি খেয়ে সবাই অন্যদিকে পালিয়ে গেছে। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে এদিকে তাকাচ্ছে। যেনো এদিকে বাঘ না হয় ভালুক আছে।

মুসল্লিদেরকে আগে দেশছাড়া করে, এখন তারা নিজেরই একঘরে হয়ে গেলেন। মসজিদের এদিকে কেউ দাঁড়াতে চাইছেনা। ই'তিকাফকারীরা হাতছানি দিয়ে সবাইকে ডাকছেন, তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। একজন দুই হাতকে প্রফেলারের মতো নেড়ে নেড়ে ডাকছে। হাতের নাড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে না, এই নাড়া কি আহবানের নাকি বিসর্জনের। সবাই ভয় পেয়ে আসো বেশি অন্য পাশে সরে যাচ্ছে।

দুয়েকজন ভয়ে ভয়ে পা পা করে কাতার পুরো করলো। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলো, পাছে আবার ইতিকাফকারীদের গায়ের সাথে গা লেগে যায় না কি। হুরমতে মুলামাসা সাবিত হয়ে যায় কি না। দুয়েকজন ইতিকাফকারীদের তো দেখে মনে হতো, তারা পারলে বিছানায় শুয়েই নামাজ পড়েন। রথ-হাত চলছে না। কতক্ষণ পরপরই ওয়াক থো করে জানালা দিয়ে থু থু ফেলার বহর দেখলে বোঝা যায় ইতিকাফে থাকলে বোধহয় রোজায় বেশি ধরে।

জোহরের নামাজ পড়েই বিছানা পুরোটা না বিছিয়েই সামান্য কাত হওয়া। চোখ বন্ধ হলো কি হলো না। হাতে সেই তাসবীহ। ঘুরছে। একবার তো দেখলাম নাক ডাকছে,

তখনও তাসবীহ ঘুরছেই। অবিরাম। আসরের কিছুক্ষণ আগে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। হেলেদুলে রওয়ানা হলেন হাম্মামের দিকে। ওখানে ওযুখানায় বসে, মিসওয়াক করতে করতে টুকটাক আলাপ।

আসরের পরের সময়টা মসজিদের বারান্দায়, এমাথা-ওমাথা হেঁটেই কেটে যায়। হাতে তাসবীহ। ইফতারির আগে ছোট নাতনি ইফতার নিয়ে এসেছে। তার কাছে বুড়ির খোঁজ-খবর নেয়া সহ আরো কিছু কাজ মাঝেমধ্যে কোলের একটা নাতিও আসে। সেটাকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকা। এই ফাঁকে বড় নাতনিটা এদিক ওদিক তাকিয়ে লুকিয়ে চোরা চোর ভাব নিয়ে, দাদাকে কী যেন দিলো। দাদাও কেউ দেখেনি মনে করে, জিনিসটা নিয়ে সুড়–ত করে পকেট রেখে দিলেন।

মাগরিবের পর। প্রায় সব বুড়ো একবার বাথরুমে যাবেনই। মসজিদের বাথরুমও একটা। সবাই লাইন ধরে, পালাক্রমে যান। খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বদনা বদল করার পাশাপাশি আরো কী একটাও যেনো দ্রুত হাত বদল হলো। তখন বাথরূমে অন্য কেউ গেলে, তামাকের গন্ধে গা গুলিয়ে আসবে। আমি আর বেলালও প্রথম যে কাজটা করলাম, তা হলো, পুরো মসজিদ ঘুটে-চষে যেখানে যত তাসবীহ পেলাম, জড়ো করলাম। সবগুলো খুলে একটা সুতোয় সবগুলো গুটি গাঁথলাম। যা একখান তাসবীহ দাঁড়ালো না, দশদিন কেনো পুরো রামাদান একটানা গুনে চললেও অর্ধেক শেষ হবে কিনা সন্দেহ।

এরপর দুজনের কাজ হলো, পুরো তাসবীহটা গুণে দেখা। কয়টা মুক্তোর দানা দিয়ে আমাদের ম্যারাথন মালাখানির গঠনকার্য সমাধা হইলো। গুণতে গুণতে গুণতে গুণতে শেষই হতে চায় না। শেষে দুজনে ভাগাভাগি করে নিলাম। প্রথমে তাসবীহটা লম্বা

করে শুইয়ে দিলাম। প্রায় পুরো মসজিদ সমান লম্বা হলো। শুরু অন্তহীন গণনা। আগে তো গুণে দেখতে হবে। না হলে কয়বার খোদাকে ডাকলাম কিভাবে বুঝবো?

২৪

আমাদের দুই ইতিকাফকারীর একজনেরও দাড়িগোঁফ গজায় নি। বয়েস কতই বা হবে, বার কি তের হবে। আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হলো, আমরা একবার হলেও তাসবীহটা শেষ করবোই করবো। ইনশাআল্লাহ।

তাসবীহটা আমরা লুকিয়ে রাখি। তবুও কিভাবে যেনো গ্রামের এক বুড়ো দেখে ফেললো। বুড়োটা সারাক্ষণ টিকটিক করে শুধু আমাদেরকে দেখে। হুযুরের কাছে বিচার দিলো। দুই হাফেয সাহেব মসজিদে বসে বসে কী যেন করে।

হুযুর সেদিন সময় পেলেন না। পরদিন এসে ধরলেন:

- কি রে তোরা মসজিদে বসে বসে না কি দুষ্টুমি করিস?

- জ্বি না হুযুর।

- তাহলে একজন যে বললো!

- জ্বি না, হুযুর, আমরা সারাদিন বসে বসে যিকির করি।

- তোরা যিকির করিস! (হুযুরের চোখে চরম অবিশ্বাস) কিভাবে?

- তাসবীহ দিয়ে।

- কই তসবীহ দেখি?

এবার ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। ওটা কিভাবে দেখাই। ওটা আমরা বড় একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে মিহরাবের পেছনে রেখে দিয়েছি। যখন কেউ থাকে না, দুই দিনের পাখির ছানার আদরে, পরম মমতায়, আলতোওওও করে বের করে আনি। আমাদের দেরি দেখে হুযুর ধমক লাগালেন। বিলালটা ভীতুর ডিম। সে দৌড়ে গিয়ে হাঁচড়ে পাচড়ে পলিথিনটা নিয়ে এলো।

- এই ব্যাগে কী আছে?

- তাসবীহ আছে, হুযুর।

- কয়টা?

- একটা।

- ওরে বাবা! কই দেখি দেখি?

বিলাল ওটা টেনে বের করতে গেলো। টানছে তো টানছেই। শেষই হচ্ছে না। আমি হুযুরের চেহারার দিকে নজর রাখছিলাম, হুযুরের চেহারায় প্রথমে কৌতূহল ফুটে উঠলো। তারপরে বিস্ময়। তারপরে আবার বিস্ময়। তারপর বোধহয় মুগ্ধতা। অনেকক্ষণ পর, বোধহয় আধাঘণ্টা পরে, বিলালের তাসবীহ টানা শেষ হলো। পুরো তাসবীহ বাইরে তাশরীফ আনলেন।

হুযুর ওটার জগতজোড়া বিস্তৃতি দেখে, কেমন যেন চমকে চমকে উঠছিলেন। আমি তখন দৃষ্টি নিচু করে ছিলাম। একসময় দেখি হুযুর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। সশব্দে হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে হুযুরের চোখে পানি এসে গেলো। বিষম খেলেন বারকয়েক।

হাসি থামিয়ে কিছু একটা বলতে যান আবার হাসি এসে পড়ে। এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করেও হুযুর হাসিকে বাগে আনতে পারলেন না। শেষে রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরে মসজিদ থেকেই বের হয়ে গেলেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তৃতীয় দিন তারাবীহের পর বিলাল বললো, সে নাকি তাদের মসজিদে দেখেছে, যারা ইতিকাফে বসে তারা, নামাজের সময় হলে পাগড়ি বাঁধে। আচ্ছা! তাই নাকি? তাহলে তো আমাদেরকেও পাগড়ি বাঁধতে হবে? শুরু হলো আমাদের পাগড়ির প্রস্তুতি।

২৫

আমাদের কাছে রুমাল নেই। পাগড়ি বাঁধবো কী দিয়ে? বিষয়টা দুজনকে বেশ ভাবনায় ফেলে দিলো। মাদরাসার অধিকাংশ কামরাই বন্ধ। তালা মারা। না হলে ওখান থেকে সংগ্রহ করা যেতো। আমাদের মসজিদে এবার নতুন কার্পেট আনা হয়েছে। কার্পেট রক্ষা করার জন্য ওপরে সাদা কাপড় বিছানো হয়। বিলাল বুদ্ধি দিলো, এই সাদা কাপড়গুলো দিয়ে পাগড়ি বাঁধলে কেমন হয়? আরে তাই তো? বিষয়টা এতক্ষণ চোখে পড়েনি কেনো?

সমস্যা দেখা দিলো, এতবড় কাপড় দিয়ে পাগড়ি বাঁধবো কী করে? ভেবেচিন্তে সমাধান বের করলাম। কাপড়গুলো তো মধ্যখানে জোড়া দেয়া। প্রতিটা সাদা কাপড়ই তিন-চারটা খণ্ড সেলাই করে তৈরি করা হয়েছে। মেপে দেখলাম। সেলাই খুলে দুইটা ভাগ নিলে দুজনের মাথার পাগড়ির জন্য ঢের হবে।

এখন তো মসজিদে মুসল্লি নেই। বড়জোর দুইটা কাতারে সাদা কাপড় বিছাতে হয়। বাকিগুলো এমনিতেই পড়ে থাকে। বিলাল আশ্বাস দিলো। রামাদানের পর ওদের বাড়ি

থেকে, কাপড়গুলো আবার সেলাই করে আনবে। এবার আর কোনও সমস্যা রইলো না। দুজনের মাথায় এখন ইয়াব্বড় পাঠানমার্কা বাইশগজি পাগড়ি।

আমাদের মাথার চেয়েও পাগড়ির আকৃতি বড়। পাগড়ি বেঁধেছি, আর খোলার নামগন্ধ নেই। ঢলঢলে পাগড়ি পরে মনের আনন্দে মসজিদময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুজন মসজিদের দুমাথায়। হাতে তাসবীহ। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, হুযুর দেখে ধরে ফেলেন কি না? নাহ, এই বেলা উতরে গেলাম। হুযুর কালেকশনের জন্য ঢাকা যাবেন। আমাদের খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন:

- মাদরাসার সব কিছু এখন তোদের। যা ইচ্ছা হয় খাবি। গাছে ডাব আছে। পুকুরে মাছ আছে। শুধু হিসাব রাখবি। ব্যস তাহলেই হলো। আমি এসে দাম পরিশোধ করে দিবো।

আমরা দুজনে জানতাম, ইতিকাফে থাকলে মসজিদের বাইরে কথা বলা নিষেধ। ইস্তঞ্জার জন্য বের হলে অন্য কাজও করে আসা যায়। আমরা ঠিক করলাম প্রতিদিন কচি ডাব খাবো। সারাদিন যিকির করে, আর কুরআন কারীম তিলাওয়াত করে ক্লান্ত হয়ে যাই। বাড়তি খাওয়া-দাওয়ারওতো প্রয়োজন আছে।

রাতে তারাবীহ শেষ হলো। সবাই চলে গেলে আমরা মাদরাসায় একা। পুরোপুরি ভুতুড়ে পরিবেশ। পুকুর পাড়ে ছোট ছোট অনেকগুলো নারিকেল গাছ আছে। এমন পুরুষ্ট কচি নধর ডাব দেখে রোজামুখেও জিবে জল আসতো। এবার যেহেতু হুযুর ঢালাও অনুমতি দিয়ে গিয়েছেন, সেটার সম্মান রক্ষার্থে হলেও কিছু ডাব খেতে হয়।

বাইরে বের হলে যেহেতু কথা বলা যাবে না, তাই আগেই সব কিছু ঠিকঠাক করে গেলাম। বিলাল গাছে উঠবে। আমি নিচে থাকবো। তবে দুয়েকটা ডাব যদি পানিতে

পড়ে যায় আমিই পানিতে নামবো। গাছের নিচে গিয়ে বাঁধলো ঝামেলা। দুজনেরই গা ছমছম করতে লাগলো। তাকে ইশারায় সেটা বললাম। সে ইশারার ভাব ধরতে পারলো না। নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি করলাম, নাহ, বুঝলো না।

বিলালও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কী সব বোঝাতে চাইলো, আমি তার 'হায়ারোগ্লাফিক' ভাষার মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হলাম। বিফল মনোরথে মসজিদে ফিরে এলাম। মসজিদে এসে দুজনেই হড়বড় করে কথা শুরু করে দিলাম। ঠিক হলো পরদিন আবার ডাব অভিযানে বের হবো। এতক্ষণ কথা বলতে না পারার কাযা-কাফফারা আদায় করে নিলাম।

বিলাল বললো:

- এই, হুযুরতো বলেছেন, পুকুরের মাছও ইচ্ছা হলে খেতে পারবো। আমাদের তো এখন শরীরে বেশ খাটুনি যাচ্ছে। একটু ভালোমন্দ না খেলে চলবে কী করে? হাঁ, তাই তো? মাদরাসার জালটা তো নেয়ামতখানায় আছে। চল ওটা বের করে আনি।

জালটা বের করে আনলাম। আজ যেহেতু ডাব খেতে পারলাম না, মাছ ধরা যায় কিনা দেখি। আজকে সিঁড়ির কাছেই একটা খেপ মেরে দেখি। কিছু ওঠে কিনা দেখা যাক। প্রথম খেপে কিছু উঠলো না। উঠলো একটা কাঁকড়া। ওটা জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। প্রথম দিনের অভিযানের এখানেই ইতি। আজ সাহস সঞ্চয় হলো। আগামী কাল থেকে আর ভয় লাগবে না। আমাদের ইতিকাফ কিন্তু ভাঙে নি। আমরা তো বাইরে কোনও কথা বলিনি।

জীবনের প্রথম ইতিকাফটা এভাবেই কেটে গেলো। ইতিকাফটা যেমনই হোক, আমার এখন মনে হয়, সেবার হুযুর যদি জোর করে আমাকে ইতিকাফে না বসাতেন, তাহলে

জীবনটা অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতো। অনেক ভালো অভ্যাস গড়ে উঠতো না। অনেক সুন্দর চিন্তার সূচনা হতো না। আত্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টা কী, তা জানা হতো না। অজানা থেকে যেতো দীর্ঘক্ষণ যিকিরের মজা (হোক না দুষ্টুমি করে, লম্বা তাসবীহ দিয়ে)। পাগড়ির সৌন্দর্য উপলব্ধি হতো না (হোক না মসজিদের কাপড় ছিঁড়ে)। মাদরাসার প্রতি দায়িত্ববোধ আর ভালোবাসা তৈরি হতো না।

ইয়া আল্লাহ! বাকি জীবনটাও প্রতি বছর ইতিকাফে বসার তাওফীক দান করুন। আপনার ঘরে, মসজিদুল হারামেও ইতিকাফে বসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

২৬

দেখতে দেখতে বিশটা রোজা পার হওয়ার পথে। টেরও পেলাম না। এবারের রামাদান ছিলো অনেক আশা। অনেক আকাঙ্খার। অনেক প্রতীক্ষার। অনেক ভালোবাসার।

রামাদান শুরু হওয়ার আগে থেকেই, আল্লাহর কাছে কয়েকটা বিষয়ে দু'আ করে আসছিলাম।

প্রথম বিষয়: নজরের হিফাযত

আল হামদুলিল্লাহ, অনলাইন ও অফলাইন উভয় লাইনে নজরকে যতটুকু সম্ভব হিফাযত করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, তিনি তাওফীক দিয়েছেন। একদম একশ ভাগ না হলেও আমি দুর্বল বান্দা হিসেবে যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাড়ি থেকে খুব একটা বেরই হইনি। শুধু মসজিদে যাওয়ার জন্যই যেটুকু বের হয়েছি। সে হিসেবে বলা যায় নজরের গুনাহ

করার সুযোগই হয় নি। তবে ঘরে সুযোগ ছিলো, ল্যাপটপে। আমিও আশংকায় ছিলাম। কিন্তু না, আমার রাব্বে কারীম আমাকে বাঁচাতে চাইলে, কোন বাপের বেটার অত বুকের পাটা! আমাকে গুনাহের পথে নিয়ে যাবে?

দ্বিতীয় বিষয়: যবানের হিফাযত

আল হামদুলিল্লাহ, সাধারণত গীবতের প্রতি ঘৃণাবোধটা সব সময় সচেতনভাবেই মনে থাকে। মাদরাসায় থাকলে তো গীবতের খুব একটা সুযোগ নেই। সবাই ছাত্র। ওদের সাথে তো গীবত করার প্রশ্নই ওঠে না। বাড়িতে গেলেও সুযোগ নেই। কারণ আগে থেকেই একটা ভাবমূর্তিটা দাঁড়িয়ে গেছে। 'আমি গীবত পছন্দ করি না', এমন একটা কথা ঘরে চাউর হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

এই গীবত নিয়ে ঘরে হাসির ঘটনা অহরহ ঘটে। দেখা গেলো, আমি হয়তো কোথাও গেলাম। হঠাত ঘরে ঢুকেই দেখি সবাই চুপ করে বসে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। তখন বুঝে যাই কিছু একটা হচ্ছিলো, আমাকে দেখেই মুখের ব্রেক কষেছেন।

বড় আপুর কথা হলো:

- আচ্ছা! গীবত না করে থাকা যায়? মহিলারা একসাথ হলে অমন একটু আধটু গীবত হয়ই। গীবত না করলে পেট ফুলেই মরে যাবো। আর অন্যের কথা বলা বাদ দিলে কথা বলারই তো কিছু থাকে না। তাহলে তুই-ই বল,সারাদিন কি আমরা তসবীহ নিয়েই বসে থাকবো?

এ নিয়ে ঘরে অনেক হাসাহাসি হয়। ধরা যাক ভাইবোন সবাই আম্মুকে ঘিরে বসে আছি। কথাবার্তা চলছে। গল্পগুজবও চলছে। হঠাত করেই ব্রেক ফেল। অজান্তেই 'তেনারা' মূল প্রসঙ্গে (গীবত) চলে গেলেন। পাশ থেকে আরেক জন কনুই দিয়ে গুঁতো

মারার পরও তিনি সম্বিত ফিরে পাচ্ছেন না। কথার শেষপ্রান্তে গিয়ে খেয়াল হলো, সবাই মিটিমিটি হাসছে। জিবে কামড় দিয়ে হার্ড ব্রেক।

আবার অনেক সময়, আগেই অনুমতি নিয়ে নেয়া হয়:

- ভাই! এই একবারই শুধু গীবত করবো। এই শেষ বার। ভাবটা এমন যেনো গীবতের গুনাহর মার্জনার দায়িত্ব আল্লাহ আমাকেই দিয়েছেন। তারপরও একশ ভাগ গীবত থেকে বাঁচতে পারি নি। তবে চেষ্টা করেছি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

তৃতীয় বিষয়: শ্রবণের হিফাযত

আগের দুটোর তুলনায় এ বিষয়টাতে অনেক বেশি নাম্বার পাবো। আল হামদুলিল্লাহ। শ্রবণের গুনাহর সীমা তো খুব বেশি নয়। তাই আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। বরং বলা ভালো, শ্রবণের মাধ্যমে অনেক সওয়াবই অর্জন হয়েছে। সারাদিনই বলতে গেলে কুরআনের আওয়াজই কানে পশেছে।

এছাড়াও কিছু পার্শ্ব বিষয়েও সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি:

প্রথম বিষয়: চিন্তার হিফাযত

মনে আবোল-তাবোল চিন্তা তো আসতেই থাকে। কত কী যে মাথায় আসে, তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়মকানুন নেই। তবে গুনাহ হয়, এমন চিন্তা একদম আসে নি তা বলবো না, কিন্তু ঘরে থাকাতে গুনাহের চিন্তা অতটা প্রশ্রয় পায় নি।

তবে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট হয়েছে কিছুটা। আকাশ-কুসুম কল্পনাও হয়েছে অনেক। অর্থাত, আমি অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়েছি। আমি বিমান চালিয়ে

সরাসরি ইয়ের 'ময়দানে' হাযির হয়েছি। শাঁই শাঁই করে বাইক চালিয়ে কমান্ডো অভিযান চালিয়েছি। এসবের জন্য আশা করি আল্লাহ ধরবেন না।

দ্বিতীয় বিষয়: পাঠের হিফাযত

এটা ছিলো আমার জন্য অত্যন্ত দুর্গম আর দুরূহ একটা 'ফ্রন্ট'। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু পাঠের নেশা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। পাঠের হিফাযত বলতে, যে সমস্ত বইয়ে কোনও না কোনও ভাবে গুনাহের লেশমাত্র আছে। এটাও পুরোপুরি না হলেও প্রায় অনেকটা আল্লাহর রহমত পেয়েছি। আল হামদুলিল্লাহ, তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।

২৭

রামাদানে ভালো হয়ে চলার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলাম, সেই আগে থেকে। অন্য মাসের তুলনায়, এই মাসে যেনো আরো ভালো হতে পারি। খুব বেশি আমল করতে পারি আর না পারি, অন্তত যতটা সম্ভব গুনাহের পরিমাণ যাতে কমিয়ে আনতে পারি। আমি চেষ্টা করেছি, পুরোপুরি সফল হতে না পারলেও, আল্লাহ তা'আলার কোটি কোটি শোকর, তার তাওফীক অনেক ক্ষেত্রেই শামিলে হাল হয়েছে।

পুরো বছরে করার সুযোগ হয়ে ওঠে না, এমন কিছু আমল রামাদানে করার নিয়্যাত ছিলো। এমন কয়েকটা আমাল হলো:

১) জীবনসাথীকে খুশি করাঃ তাকে বেশি করে সময় দেয়া। তার কাছ থেকে ভালো মানুষের সনদ নেয়া। কারণ এটা ছাড়াতো জান্নাতে যাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়বে।

এটা জান্নাতে যাওয়ার পাসপোর্ট। প্রিয় হাবীব (ﷺ) তো এমনটাই বলেছেন। চেষ্টা করেছি। তবে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি এমনটা হয়তো বলতে পারবো না। কিন্তু করেছি। এবার বাকিটা 'ওর' ঔদার্য আর প্রিয় রব্বে কারীমের দয়া-করুণা।

২) সন্তানদের সাথে সময় কাটানোঃ এটাও চেষ্টা করেছি। সারা বছর নানা ঝামেলায়, কাজের চাপে পিষ্ট হয়ে চেপ্টা হয়ে থাকি। বাড়ি থেকে দূরে থাকার কারণে ঠিকমতো দেখা সাক্ষাতও হয়ে ওঠে না। মাঝে মধ্যে যাওবা হয়, তাও আসা যাওয়ার আয়োজন প্রয়োজনেই সময় কেটে যায়। আর্থিক কারণে অনেক সময়, অনেক ছোটখাটো আব্দারও মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। আল হামদুলিল্লাহ যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি। ওদের জন্য নিজে ঘোড়া হয়েছি। হামাগুড়ি দিয়ে ওদের পর্যায়ে নেমে আসার চেষ্টা করেছি। সবই করেছি, প্রিয় হাবীবের (ﷺ) ইত্তিবায়ে। রাব্বে কারীমের রেজামন্দীর জন্য। ওরাও বাবার পিঠে চড়তে পেরে বিমলানন্দ উপভোগ করেছে বলেই মনে হয়েছে। বাবার পিঠের বারোটা বা যা-ই বাজুক না কেনো।

৩) মায়ের সেবাঃ আমার আজন্ম স্বপ্ন। বায়েজিদ বোস্তামীর মতো অন্তত এক রাতের জন্য হলেও মায়ের শিয়রে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা। বিষয়টা হাস্যকর। ব্যাপারটা ছেলেসুলভ। কিন্তু কলসি হাতে পানি আনতে তো এখন আর দূরে ঝরণার কাছে যেতে হয় না। সামান্য কয়েক কদম হেঁটে ফ্রিজের কাছে গেলেই হয়। দুখের ব্যাপার হলো, আম্মু মরে গেলেও রাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলবেন না যে, আমাকে পানি এনে দে তো। এখন উপায়? এমন দুষ্টুমিমূলক ইচ্ছা কাওকে বলাও যায় না। আবার ভেতরে ইচ্ছাটা সারাক্ষণই কাতুকুতু দিয়ে চলছে। শেষে আল্লাহ তা'আলা পানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা না হলেও, পাখা হাতে দাঁড়ানোর তাওফীক দিলেন। অবশ্য দাঁড়িয়ে নয় সারারাত

পাখা হাতে বসে থাকার তাওফীক হয়েছে। আবার সারারাতও নয়, তারবীহের পর থেকে সাহরি পর্যন্ত। তৃপ্তি হলো না। ইচ্ছেটাও দমলো না। তবুও হলো তো!

মায়ের হাত-পা টিপে দেয়ার তাওফীক তো প্রায় বাড়িতে গেলেই হয়ে থাকে। কিন্তু মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। সেই জান্নাতে চুমু দেয়ার শখ ছিলো অনেক দিনের। কিন্তু লজ্জা-সংকোচ, সময়-সুযোগ ইত্যাদির মেলবন্ধন হয় উঠছিলো না। এবার সব দ্বিধা-জড়তা ঝেড়ে, একদিন বিশেষ একটা উপলক্ষে, জীবনসাথীকে ডেকে আনলাম, ছেলেকে ডেকে আনলাম, তাদেরকে সাক্ষী করে আমার জান্নাতে চুমু এঁকে দিলাম। পায়ের তলায় যে ধুলো ছিলো সেগুলোর ওপরেই।

মনে আরো কতো পাগলাটে ইচ্ছে যে কিলবিল করে তার ইয়ত্তা নেই। রামাদানকে সামনে আরো আরো অনেক পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু মানবিক দুর্বলতার কারণে হয়ে ওঠেনি। ইনশাআল্লাহ, আশায় বুক বেঁধেছি। হায়াতে কুলোলে, সামনের বার দেখি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

৪) বাবার কবরের পাশেঃ এটা ঠিক, ঈসালে সাওয়াবের জন্য কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআনখানির প্রয়োজন নেই। যে কোনও জায়গা থেকে পড়লেই আল্লাহ তা'আলা সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন। তারপরও মন মানে না। ইচ্ছা ইচ্ছা ইচ্ছা, বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবো। লম্বা করে কবর যিয়ারত করবো। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছিলো না।

এবারও হয় নি। আবার একদম হয়নিও বলা যাবে না। তবে কবরের সামনে দাঁড়িয়েই কুরআন খতম করার বিষয়টাকে প্রশ্রয় দিলাম না। আল্লাহ তা'আলাই বিষয়টার সুন্দর সমাধান করে দিলেন। আব্বুর কবরটা হলো একদম মসজিদ ঘেঁষে। মসজিদের জানালা থেকে সামান্য দূরে। জানালার পাশে বসলেই মনে হয় আববুর কোল ঘেঁষে

বসে আছি। ওখানে বসেই কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক হয়েছে। পুরো খতম হয় নি। এজন্য মনটা বড়ই অস্থির। একজন আলিম সন্তান হয়ে কবরবাসী পিতার জন্য কী করছি?

৫) ভাইবোনদের সাথেঃ বিয়ের পর ভাইবোনদের মাঝে সম্পর্কে চিড় ধরে। ফাটল দেখা দেয়। আমাদের মাঝে সেটা না হলেও সম্পর্কের মধ্যে কেমন যেন একটা শীতল ভাব জন্ম নিয়েছে। দূরে থাকার কারণে আমার সাথে একটু বেশিই হয়তো বা। প্রিয় রামাদান উপলক্ষে আমার নিয়্যাত ছিলো, সেই শীতলতাকে উষ্ণতায় পরিণত করা। এ জন্যে, এবার আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক চেষ্টা করেছি। যা কখনো করি না, এমন অনেক কাজই করেছি। সিলায়ে রিহমির জন্য। ভাই বোনদেরকে খুশি করার জন্য। বিশেষ করে বোনদেরকে। অনেকদূর পথ হেঁটেছি।

যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটা হয় নি। এটুকু সান্তনা যে, শুরুটা তো করতে পেরেছি। আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ তাওফীকদাতা। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে বাকি কয়টা দিন গুনাহমুক্ত জীবন কাটানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

২৮

রামাদানের শেষ দশক হলো রামাদানের রাজা। এই দশকের রাজা হলো লাইলাতুল কাদর। লাইলাতুল কাদরকে পাওয়ার সুবিধার্থে ই'তিকাফের ব্যবস্থা আছে এই দশকে। সরাসরি আল্লাহর ঘরের মেহমান।

শেষ দশকের প্রস্তুতি নিচ্ছি রামাদানের অনেক আগে থেকেই। মানসিক প্রস্তুতি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি। পারিবারিক প্রস্তুতি। শিক্ষাগত প্রস্তুতি। আরো নানা প্রস্তুতি।

আত্মিক প্রস্তুতি। কিন্তু মনকে গুনাহমুক্ত রাখার প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়ে গেছে। নিজের মনকে শক্ত করে কষে বাঁধতে পারিনি। আবার বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো যাতে না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হয়।

শেষের দশকটা কাটানোর প্রস্তুতি হিসেবে যে প্রস্তুতি নিয়েছি তা হলো:

১) সারাক্ষণ কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবো। আগে ভেবেছিলাম সাথে তাফসীরও রাখবো। বিশেষ করে আমার এখনকার প্রিয় তাফসীর 'মারাহে লাবীদ'। ওটা সংক্ষেপের মধ্যে চমতকার এক কুরআনের ভাষ্য। পরে ভাবলাম নাহ, সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহ.) কে অনুসরণ করে শুধু কুরআন, শুধুই কুরআনকে নিয়ে থাকবো। কোনও তাফসীর বা তারজামার আশ্রয় নেবো না। এই দশটা দিন আল্লাহর কালামের সাথে কোনও বান্দাকে মেশাতে চাই না। আর তিলাওয়াতই বেশি করবো। তাদাব্বুরের সুযোগ খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না।

২) ইসলামী বইমেলা থেকে, শেষ দশকের প্রস্তুতিস্বরূপ কিনে এনেছি, কামালাতে আশরাফিয়া। থানুভি (রহ.) এর খলীফ মাওলানা ঈসা (রহ.) এই কিতাবের সংকলক। উর্দুটা আগেই কিছুটা মুতালায়া করা ছিলো। এবার বাংলাটা পেয়ে ভাবলাম কিতাবটা শেষ করেই ছাড়বো। ইনশাআল্লাহ। খুবই প্রভাব বিস্তারকারী একটা কিতাব। পড়লে বাস্তবিকই প্রভাব পড়ে। ভালো হতে ইচ্ছা করে। ও হাঁ, কিতাবটা হলো থানুভি (রহ.) এর বাছাই করা মালফূযাতের সংকলন। কিতাবটা প্রতি সপ্তাহে একবার করে শোনার সৌভাগ্য হয়। প্রফেসর হামীদুর রাহমান (দা.বা.) এর খানকায়।

৩) বাছায়েরে হাকীমুল উম্মাত। এই কিতাবটাও ভেবেছি শেষ দশকে আবার পড়বো। আগাগোড়া। এত মোটা বই পড়ে শেষ করা যাবে কিনা জানি না। নিয়্যাত করতে দোষ

কী?। এই কিতাবটাও থানুভি (রহ.) এর মালফূযাতের সংকলন। ডাক্তার আবদুল হাই আরেফি (রহ.) কর্তৃক সংকলিত। সবার জন্য অবশ্য পাঠ্য একটা কিতাব।

৪) মালফূযাতে ফুলপুরি (রহ.)। এই কিতাব হলো মাওলানা আবদুল গণী ফুলপুরি (রহ.) এর মালফূযাতের সংকলন। হাকীম আখতার সাহেব (দা বা) কর্তৃক সংকলিত। মাওলানা ফুলপুরি (রহ.) এর প্রতি আমার অনেক আগ থেকেই এক অমোঘ আকর্ষণ ছিলো। তিনি থানুভি (রহ.) এর প্রথম সারির খলীফা।

৫) আপবীতি। প্রতিবারই নিয়্যাত করি, এবার অবশ্যই কিতাবটা পড়বো। অনেক আগে পড়া হয়েছে। সব এখন ধোঁয়াশা হয়ে গেছে। বাছাই করা কিছু জায়গা মাঝে মধ্যে পড়া হয়। কিন্তু আগাগোড়া পড়া প্রয়োজন। তাই নিয়্যাত করেছি এবার কাজটা সেরে ফেলবো। ইনশাআল্লাহ।

দশদিনের জন্য এই তালিকা বেশ লম্বা হয়ে গেলো। পুরো লক্ষ্যমাত্রা না হোক, অন্তত কিছুটা অর্জন হলেও মন্দ হবে না। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে গুনাহমুক্ত জীবন দান করুন। আমীন।

২৯

প্রতি রামাদানের শেষ দশকে একটা প্রশ্ন খোঁজার চেষ্টা করিঃ

“আল্লাহ তা‘আলাকে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ কোনটা?”

একবার এক রকমের ভাবনা আসে। প্রত্যেকবারই, শেষ দশকে একটানা ভাবনার ফলে, অনেকগুলো চিন্তা-সিদ্ধান্ত মাথায় আসে। সেগুলো প্রত্যেকবারই লিখে রাখি। চিন্তাগুলো সাথে সাথে ধরে না রাখলে, পরে হারিয়ে যায়।

বিশাল একটা ডায়েরি ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। শুধু শেষ দশকের চিন্তাগুলোতেই। সেই ডায়েরিটা আল্লাহর কোনও এক বান্দা না বলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেও প্রায় এগার বছর আগের কথা। আমার এখন ভাবলে হাসি আসে, সেই ছেলেবেলায়-বয়সন্ধির চিন্তাগুলো কতই না মজার আর হাসির ছিলো।

এরপর থেকে লেখা ডায়েরিগুলো সযতনে রাখার চেষ্টা করি। আমি এবার নিয়্যাত করেছিলাম, এবার যত ভালো চিন্তাই আসুক লিখবো না। দেখি কী হয়।

ঈদের রাতে, মাদরাসায় একা একা বসে ভাবছিলাম, এবারের শেষ দশকে আমার প্রাপ্তি কী? প্রতিবারই একটা না হয় একটা মূল চিন্তাসহ অনেকগুলো অনুচিন্তা মাথায় নিয়ে মসজিদ থেকে বের হই। এবার এমনিতেই মন খারাপ করে শেষ দশক শুরু করেছিলাম। বারবার গাযার শিশুদের কথাই মনে হচ্ছিলো। সামনের দশটা দিন আর কোনও খবর পাবো না ভেবে মনটা খারাপ হচ্ছিলো।

বেশির ভাগ সময়ই কেনো যেনো চিন্তার গতি প্রকৃতি শুধু একটা দিকেই মোড় নেয়। যেমন জীবনের প্রথম ই‘তিকাফ তো দুষ্টুমি করেই কেটেছে। প্রথমবারের মতো,

বুঝেশুনে ই'তিকাফে বসি কাফিয়ার বছর। পুরো দশটা দিনই কেটেছে মাওলানা মাসউদ আযহারকে নিয়ে। সেবার মাওলানাকে ভারতের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য বিমান হাইজ্যাক করা হয়।

পুরো শেষ দশকটা কেটেছে আল্লাহর রাস্তার ভাবনায়। শাহাদাতের তামান্নায়। এর পরের প্রায় প্রতিটা রামাদানের শেষ দশকটাই কোন না কোনও ভাবে চিন্তার গতিটা সেদিকেই ধাবিত হয়েছে।

একবার তো এমন হলো, শেষে ক'টা দিন একদম খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেলো। অতি শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। দুচোখ সারাক্ষণই লাল হয়ে, ফুলে থাকতো, এত বেশি কান্না আর কখনো আসেনি। এত শোকের কারণটা হলো, সেবার আমেরিকা হামলে পড়েছিলো আফগানিস্তানের ওপর। আর কান্দাহারের পতন ঘটেছিলো রামাদানের শেষের দিকে। আমীরুল মুমীনিনের জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতে ক্রমশই ভেতরে একটা প্রচণ্ড আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিলো।

এবারের শেষ দশকটা কাটলো গাযার জন্য একবুক ভালোবাসা নিয়ে। আর প্রায় প্রতিদিনই শুনেছি, মাওলানা হক নেওয়ায জঙ্গি আর মাওলানা যিয়াউর রাহমান ফারূকি আর মাওলানা আ'যম তারিক সাহিবের বয়ান। রাহিমাহুমুল্লাহু। তাকাব্বালাল্লাহুস শাহাদাতা মিনহুম।

তো এবারের শেষ দশকের উপলব্ধি হলো, আল্লাহকে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ হলোঃ **"তার পতাকাকে বুলন্দ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া"**

৩০

আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ:

= শুরু হবে বিশ রাকা'আত তারবীহ।

= শুরু হবে সুন্দর ও মধুরতম ত্রিশটা দিন।

= শুরু হবে মজার-মজার সাহরী।

= শুরু হবে মজার-মজার ইফতারী।

= শুরু হবে ইবাদতের মাস।

= শুরু হবে কুরআনের মাস।

= শুরু হবে ভাল হওয়ার মাস।

আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রামাদান। আমীন

৩১

এক শায়খকে প্রশ্ন করা হলোঃ

- আমরা কিভাবে রামাদানের প্রস্তুতি নেব? কিভাবে রামাদানকে স্বাগত জানাব?

- তোমরা বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাক। কারণ রামাদান হলো তা'আত-আনুগত্যের মাস। আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক লাভের মাস।

তোমার আমলানামায় গুনাহ থাকলে, মাফ পাওয়ার জন্যে বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাক। কারণ, গুনাহ বান্দাকে তার রবের তাওফীক হতে বঞ্চিত করে দেয়।

৩২

বিশিষ্ট মুফাসসির সা'দী (রাহ.) বলেন:

- তুমি যখন বলো:

- আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রামাদান (ইয়া আল্লাহ! আমাদের কাছে রামাদানকে পৌঁছে দিন)।

তখন তুমি এ দু'আ করতেও ভুলো না:

- হে আল্লাহ! আমাদেরকে রামাদানের বরকতও দান করুন।

নিছক রামাদান পৌঁছার মাঝে তো কোনও কল্যাণ নিহিত নেই, কল্যান হবে তো, যদি আমি রামাদানের বরকত লাভ করতে পারি। আমল করতে পারি।

৩৩

রামাদানের কি কোনও আলাদা ঘ্রাণ আছে? মনে হয় আছে। যতই দিন গড়াচ্ছে, রামাদানের সুবাস-সৌরভ এসে মনের নাকে আলতো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। উমমম!!!

৩৪

রামাদানের কিছু প্রাপ্তিঃ

১: একমাস রোযা রাখতে পারা।

২: রাতে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া। কুরআন খতম করা।

৩: কুরআন তেলাওয়াত। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে। নামাযের বাইরে।

৪: আল্লাহর বেশি বেশি যিকির।

৫: বেশি বেশি দু'আর সুযোগ।

৬: বেশি বেশি দান-সাদাকার মানসিকতা।

৭: ভাল কাজের প্রতি তুলনামূলক বেশি আগ্রহবোধ।

৮: শেষ দশকে ইতেকাফ। লাইলাতুল কদরের সন্ধান।

৯: সাদাকাতুল ফিতর। যাকাত আদায়।

১০: সব সময় মনে মনে এক ধরনের আল্লাহভিমুখীতা অনুভব করা।

৩৫

রামাদানের অভ্যর্থনা: ১

১) আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারি, তিনি যেন আমাকে রামাদান পর্যন্ত হায়াত দান করেন। পরিপূর্ণ সুস্থ্য অবস্থায় রামাদান মাসটা অতিবাহিত করতে পারি। উৎসাহ-

উদ্দীপনার সাথে পুরো মাস আল্লাহর জন্যে ব্যয় করতে পারি। সিয়াম-কিয়াম-যিকির করতে পারি। বুযুর্গানে কেরাম রামাদান আসার আগে থেকেই দু'আ শুরু করতেন। এই মাসের ইবাদতসমূহ কবুল করার জন্যে দু'আ করতেন।

বারবার পড়তে পারি:

اللهم بَلِّغْنا رَمَضانَ

ইয়া আল্লাহ! আমাদের কাছে রামাদানকে পৌঁছে দিন।

রামাদানের চাঁদ দেখে বলতে পারি:

الله أكبر، اللهم أَهِلَّه عَلَيْنا بِالأَمْنِ والإِيْمانِ، والسَّلامَةِ والإِسْلام، رَبِّيْ وَرَبكَ الله

২) আমরা রামাদানের মতো এতবড় একটা নেয়ামত পেতে যাচ্ছি, সেজন্য আল্লাহর কাছে নিয়মিত শুকরিয়া আদায় করা। আলহামদুলিল্লাহ বলা। আল্লাহর প্রশংসা করা।

একজন মুমিনের প্রতি আল্লাহর অনেক বড় একটা নেয়ামত হলোঃ আল্লাহর ইবাদত করতে পারা, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা।

৩) রামাদানের আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করা। নবীজি (ﷺ) ও তাই করতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের কাছে রবকতময় রামাদান এসেছে। আল্লাহ এই মাসে তোমাদেরও ওপর রোযা ফরয করেছেন। এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়।

বুযুর্গানে কেরামও রামাদানের আগমনে ভীষণ আনন্দিত হতেন। কোমর বেঁধে ইবাদতের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করতেন।

৪) রামাদানের সময়কে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আমরা দুনিয়ার কাজের জন্যে মাস নয় শুধু এক বছর আগে থেকে গভীর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হই, দ্বীনের কাজে কেন অবহেলা হবে? দুনিয়া তো মুমিনের অভীষ্ট নয়। আখিরাতই হলো মুমিনের আসল ঠিকানা। তাই আমরা অত্যন্ত সচেতন থাকবো যেন রামাদানের প্রতিটি সেকেন্ড থেকে ইবাদতের ফসল তুলে আনতে পারি। প্রতিটি সেকেন্ডে আমলনামাকে সমৃদ্ধ করতে পারি। এজন্য ভাল হয় একটা রুটিন বানিয়ে নিলে। কখন কী করবো। প্রতিদিন কতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করবো। কয় রাকাত নফল পড়বো। কয়বার দুরূদ পাঠ করবো। কোন কোন যিকির করবো।

৫) শুধু পরিকল্পনা করলেই হবে না, সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। আমরা চেষ্টা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাওফীক দান করবেনঃ যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে, সেটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে (মুহাম্মাদ: ২১)।

৬) রামাদানের মাসয়ালা-মাসায়েল সাধ্যানুযায়া জানার চেষ্টা করা। রামাদানের রোযা ফরয। এ সম্পর্কিত অতীব প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করাও ফরয। ফরয আমলের ক্ষেত্রে না-জানার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই রামাদান আসার আগেই আমরা চেষ্টা করবো, রামাদানের আনুষাঙ্গিক 'ইলম' অর্জন করে নিতে। যেন আমার রোযাটা বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ঃ তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও (নাহল: ৪৩)।

৭) শুধু ইবাদত-বন্দেগী করার নিয়্যত করলেই হবে না, পাশাপাশি গুনাহ ছাড়ার সুতীব্র বাসনাও মনে রাখতে হবে। সত্যিকার তাওবা করতে হবেঃ আমি সব ধরনের গুনাহ থেকে তাওবা করছি। আর কখনো এই গুনাহ করবো না।

রামাদান তো তাওবারই মাস। এ-মাসে তাওবা না করলে আর কখন?

“হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে” - (নূর: ৩১)।

৮) রামাদানে ইলমচর্চার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা। পড়ার জন্যে কিছু বইপত্র। শোনা বা দেখার জন্যে কিছু অডিও-ভিডিও। অথবা আশেপাশে কোথায় রামাদান বিষয়ক মাহফিল বা মযাকারা হয়, সেটা জেনে রাখা। নিজেদের উদ্যোগেও ঘরোয়া মজলিসের আয়োজন করা যেতে পারে। একজন আলিমকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তিনি নিয়মিত কিছু বয়ান করে যাবেন। মা-বোনেরাও উপকৃত হবে। জানা থাকলে মানা সহজ হয়। নিয়মিত ফযীলত সম্পর্কে শুনলে, জানলে ইবাদতে আগ্রহ আসবে। মনোযোগ বসবে। নবীজি (ﷺ) শা‘বানের শেষ দিন ঘোষণা দিতেন্যঃ তোমাদের কাছে রামাদান এসে গেছে!

৯) শুধু নিজে নয়, আশেপাশের ভাইদেরকেও রামাদান সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রতি উদ্যোগী হওয়া। প্রয়োজনে:

ক: হাতে লিখে বা প্রিন্ট করে রামাদান বিষয়ক আয়াত, হাদীস বা বাণী মসজিদের দেয়ালে, পাড়ার দেয়ালে লাগিয়ে দেয়া।

খ: সম্ভব হলে বইপত্র কিনে বিতরণ করা। মুসল্লীদের মাঝে। পথচারীদের মাঝে। পর্দার আড়ালের মা-বোনদের মাঝে।

গ: আপনজনদেরকে রামাদান বিষয়ক লেখার লিংক শেয়ার করা। পেনড্রাইভে করে রামাদান বিষয়ক ওয়ায হাদিয়া পেশ করা। মেমোরি কার্ড কিনে ওয়ায লোড করে, তিলাওয়াত লোড করে হাদিয়া দেয়া। সুন্দর র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে উপরে লিখে দেয়া: 'রামাদানের হাদিয়া'

ঘ: গরীব মিসকীনদের জন্যে সামান্য হলেও হাদিয়ার ব্যবস্থা করা। পুরো মাসের বা অন্তত এক দিনের 'ইফতারি-সাহরীর' ব্যবস্থা করে দেয়া। যাকাত-ফিতরা তো আছেই। এর বাইরে যতটুকু সাধ্যে কুলোয় চেষ্টা করা।

১০) আসন্ন রামাদান হবে আমার জীবনে নতুন একটা অধ্যায়। নবজীবনের সূচনা:

ক: আল্লাহর কাছে খালেস তাওবার মাধ্যমে।

খ: নবীজি সা.-এর আনুগত্যের মাধ্যমে। তার আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে।

গ: আম্মা-আব্বা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচারের মাধ্যমে।

ঘ: সমাজের জন্যে একজন কল্যাণকামী মানুষ হয়ে।

আমরা রামাদানকে স্বাগত জানাব:

১: পানির আশায় ফেটে চৌচির হওয়া যমীনের মতো।

২: মরুভূমিতে পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো।

৩: ডাক্তারের আশায় বসে থাকা অসুস্থ ব্যক্তির মতো।

৪: দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ প্রহর গোনা মানুষের মতো।

ইনশাআল্লাহ!